

أَحْكَامُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِأَبِي بَكْرٍ الْجَصَّاصِ الْحَنْفِيِّ (المتوفى: ٤٨١هـ)

আহকামে বিসমিল্লাহ ও সূরা আল-ফাতিহা

أَحْكَامُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِلْجَوَاصِرِ
আহকামে বিসমিল্লাহ
ও
সূরা আল-ফাতিহা

মূল
ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.)
অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.)
সম্পাদনায়
মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

তাফসীরে সূরা আল-ফাতিহা

মূল: ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.)

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.)

সম্পাদনায়: মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: যুলহজ ১৪৩৭ হি. = সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৩৮, বিষয় ক্রমিক: ০২

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

ছুফিয়া লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মাদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

Ahkam-e-Bismillah O Sura Al-Fatiha: By: Imam Abu Bakar Al-Jassas (Rh.), Translated In Bangla By: Maulana Muhammad Abdur Raheem (Rh.), Edit By: Mohammad Abdul Hai Al Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 100

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saajbd.org

সূচিপত্র

প্রাক কথা	০৬
অনুবাদকের কথা	০৮
অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৯
গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১১
বিসমিল্লাহর আহকাম	১৪
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা	১৪
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কুরআনের আয়াত—এ পর্যায়ে আলোচনা	২০
বিসমিল্লাহ কি সূরা আল-ফাতিহার অংশ?	২২
বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার প্রথমেই উল্লেখ্য কিনা	২৩
নামাযে বিসমিল্লাহ পাঠ	৩৭
উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ	৪৫
বিসমিল্লাহ পর্যায়ে শরীয়তের হুকুম	৫৭
সূরা আল-ফাতিহার আহকাম	৫৯
নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ	৫৯
গ্রন্থপঞ্জি	৮২

প্রাক কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

ইমাম আবু বকর আহমদ আল-জাস্‌সাস (রহ.) রচিত *আহকা/মূল কুরআন* তাফসীর সাহিত্যে একটি অসামান্য অবদান। প্রায় ১২০০ বছর পূর্বে রচিত এ গ্রন্থখানি তাফসীরজগতে এক অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লামা আল-জাস্‌সাস (রহ.) ছিলেন সেকালে হানাফী মাযহাবের অবিসংবাদিত ইমাম। তাই এ ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্বভাবতই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি কুরআন মজীদের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হানাফী ফিকহ অনুসারে সমস্যাবলির সমাধান নির্দেশ করেছেন। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযাহাবের অনুসারী। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের তাবৎ কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। এ কারণে তাফসীরসাহিত্য হিসেবে এ গ্রন্থখানি এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ইসলামী পণ্ডিত ও জ্ঞানী সমাজেও এটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

এ ঐতিহাসিক তাফসীরখানির ভাষা অত্যন্ত সুপ্রাচীন-ক্লাসিকধর্মী; এর বাক-রীতিও বেশ জটিল। আধুনিক কোনো ভাষায় এর অনুবাদ করার কাজও অত্যন্ত দুরূহ। তবুও গ্রন্থটির গুরুত্ব ও উপযোগিতা বিবেচনা করে বাংলায় এর ভাষান্তরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও অনুবাদক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.)। জীবনের শেষভাবে নানান কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তিনি এ কাজটি আনজাম দিচ্ছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। পুরো গ্রন্থটির ভাষান্তর সুসম্পূর্ণ করার জন্যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রাণপনে। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তাই গ্রন্থের অর্ধেকের কিছু বেশি অংশের ভাষান্তর সম্পন্ন হওয়ার পরই তিনি এ

৭ আহকামে বিসমিল্লাহ ও সূরা আল-ফাতিহা

নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আকাজক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদ কর্মটি সুসম্পূর্ণ হতে পারেনি।

তবে মরহুম মাওলানার ইন্তেকালের পর অনুবাদকর্মের উদ্যোক্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁর অনূদিত অংশটিকে দুটি বিরাট খণ্ডরূপে প্রকাশ করে এবং বিদগ্ধ পাঠক মহলে তা যথারীতি সমাদৃতও হয়। তারপর দীর্ঘ একটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারে আর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। মাওলানা মরহুমের সৃষ্টি ও অবদানকে ধরে রাখার এবং এর বাকী অংশ অনুবাদ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমানকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দুটি বিরাট খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে দুটি খণ্ডকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থখানার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে সর্বসাধারণের উপকরণার্থে তত্ত্ব ও তথ্য-সূত্রসহ উপস্থাপনা করা হলো। আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি, গ্রন্থটির এ প্রারম্ভিক অংশটি পাঠক মহলে যথারীতি সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ গ্রন্থাকার অনুবাদক এ মহতী উত্তম কর্মের প্রতিফলন দান করুন।

০৬ জুন ২০১৬

বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

আরযগুয়ার

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

অনুবাদকের কথা

ইমাম আবু বকর আহমদ আল-জাস্‌সাস (রহ.) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *আহকামুল কুরআন* প্রথম খণ্ডের অনুবাদ পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করলাম। ৩৭০ হিজরী সনের পূর্বে এ গ্রন্থখানি রচিত হয়।

যে সময়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সে সময়ের আরবি ভাষা আজকের তুলনায় প্রায় ১১-১২ শত বছর পূর্বের। এর মধ্যে আরবি ভাষাসহ অন্যান্য আধুনিক সকল ভাষারই বিশ্লেষণরীতি ও বর্ণনাভঙ্গীতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে সে সময়কার ভাষায় রচিত গ্রন্থের একালে অনুবাদ অনেকখানি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। সেকালের বর্ণনাভঙ্গী ও বিশ্লেষণরীতি অনেকটা প্যাঁচানো। তা থেকে মর্ম উদ্ধার করে অনুবাদ করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবুও পূর্ণ সচেতনতা সহকারে গ্রন্থকারের বক্তব্য যথাযথভাবে ভাষান্তরিত করতে আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি।

আহকামুল কুরআন-এর বাংলা অর্থ: ‘কুরআনের বিধান বা হুকুমসমূহ’। কুরআনের আদেশ-নিষেধমূলক আয়াতসমূহের ফিকহী দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। কিন্তু ফিকহী কিতাবের বিন্যাস এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। এ গ্রন্থ যেহেতু কুরআনের আয়াতভিত্তিক ফিকহী আলোচনা তাই এ গ্রন্থে কুরআনের পরস্পরাকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের আলোচনার শুরুতে ‘আবু বকর বলেছেন’ একথাটির উল্লেখ বারবার হয়েছে। মনে হচ্ছে, মূল গ্রন্থকার আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) মুখে বলেছেন, অপর কেউ তা লিখেছেন তাঁরই কথা, তাঁরই নামে।

বলাবাহুল্য কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম। এতে মানুষের পালনের জন্যেই জীবন-প্রসঙ্গের আইনবিধান দেওয়া হয়েছে। ফলে ফিকহ বা ব্যবহার-শাস্ত্রের মৌল বিধান হচ্ছে এ গ্রন্থ। এ থেকে মুসলিম জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন এ আশা পোষণ করছি।

অনুবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.) বর্তমান বিংশ শতকের এক অনন্যসাধারণই ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে কয়েকজন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্বদানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন দর্শনরূপে তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

এ ক্ষণজন্মা পুরুষ বাংলা ১৩২৫ সনের ৮ ফাল্গুন (ইংরেজি ১৯১৮ সালের ২ মার্চ) সোমবার বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সনে তিনি শরীনা আলিয়া মাদরাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সনে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই একজন দক্ষ সংগঠকরূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.) শুধু পথিকৃৎই ছিলেন না, ইসলামী জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, ইসলামের অর্থনীতি, মহাসত্যের সন্ধানে, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব, আজকের চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি কমিউনিজম ও ইসলাম, সুন্নাত ও বিদয়াত, নারী, ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, আল-কুরআনের আলোকে জীবনের আদর্শ, আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ, আল-কুরআনের রাষ্ট্র ও সরকার, আল-কুরআনের আলোকে নুবুওয়াত ও রিসালাত,

বিজ্ঞান ও জীবন বিধান, ইসলাম ও মানবাধিকার, ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ইসলামী শরীয়তের উৎস, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহ.)-এর বিখ্যাত তাকসীর তাকসীরুল কুরআন, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী কৃত ইসলামের যাকাতের বিধান (খণ্ড দুই) ও ইসলামের হালাল-হারামের বিধান, মুহাম্মদ কুতুব (রহ.)-এর বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত এবং ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.)-এর ঐতিহাসিক তাকসীর আহকামুল কুরআন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থেও সংখ্যা ৬০টির উর্ধ্বে।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম (রহ.) বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-এর অন্তর্গত ফিকহ অ্যাকাডেমির একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত আল-কুরআনের অর্থনীতি এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থেও অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন নামক দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম (রহ.) ১৯৭৭ সনে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষাসম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সনে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামীয় দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সনে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারি সম্মেলন এবং ১৯৮২ সনে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এ যুগস্রষ্টা মনীষী বাংলা ১৩১৯ সনের ১৪ আশ্বিন (ইংরেজি ১৯৮৭ সনের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এ নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহ সান্নিধ্যে চলে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উচ্চ আসন দান করুন। আমীন।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল-জাস্‌সাস (রহ.) তাঁর জীবনকালে হানাফী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন আবু সহল আজ-জুজাজ (রহ.) ও আবুল হাসান আল-কারখী (রহ.)। তাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন আবু সাঈদ আল-বারদয়ী (রহ.) থেকে, তিনি মুসা ইবনে নুসাইর আর-রাযী (রহ.) থেকে, তিনি মুহাম্মদ (রহ.) থেকে। আবু বকর আহমদ আর-রাযী (রহ.) নিজে বাগদাদে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর বিদেশযাত্রা এখানেই সমাপ্ত হয়। তাকওয়া-পরহেযগারিতে তিনি ইমাম আল-কারখীর পন্থার অনুযায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হন, হাদীসের শিক্ষাও তিনি তাঁর নিকটই লাভ করেন।

ইমাম আল-জাস্‌সাস (রহ.) বেশ কয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে *আহকামুল কুরআন*, *শরহ মুখতাসার আল-কারখী*, *শরহ মুখতাসার আত-তাহাজী*, *শরহুল জামি'উস সগীর*, *শরহ জামি'উল কবীর লিল ইমাম মুহাম্মদ* প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ফিকহশাস্ত্রের মৌলনীতি (উসূল) পর্যায়েও তাঁর একখানি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি *শরহুল আসমায়িল হুসনা* ও *আদাবুল কাযা* এ দুইটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। তিনি বাগদাদে ৩০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আল-জামে বলেছেন, তিনি জিপসাম (Gypsum নরম খনিজ পদার্থ)-এর কারিগর ছিলেন বলেই 'আল-জাস্‌সাস' নামে খ্যাত ছিলেন। সাময়ানীও একথার উল্লেখ করেছেন। *তাবকাতুল কারী* গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, আহমদ ইবনে আলী আবু বকর আর-রাযী বিপুল খ্যাতিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন। তিনি আল-জাস্‌সাস অভিধায় পরিচিত। এটি তাঁর জন্যে উপাধি বা উপনাম বিশেষ। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে 'আর-রাযী' অভিধায় অভিহিত করেছেন, আর কেউ কেউ 'আল-জাস্‌সাস' বলে। মূলত একই ব্যক্তিত্ব। যদিও কোনো কোনো লোক এ দু'অভিধায় অভিহিত দু'জন ব্যক্তি মনে

করেছেন নিতান্তই ভুলবশত। আল-কামুস গ্রন্থকার তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে এ কথাটি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

আহমদ আবু বকর বাগদাদেই বসবাস করেছেন। এ নগরীর ফিকহ শিক্ষার্থীগণ তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হানারী মতের প্রাধান্য তাঁর নিকটই পরিণত হয়। খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেছেন, তাঁর জীবনকাল অবধি ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের অনুসারীদের তিনি-ই ছিলেন ইমাম। তিনি তাকওয়া-পরহেযগারিতে বিশেষ প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁকে বিচাপরতির দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। পরে আরও একবার এ প্রস্তাব দেওয়া হয়, কিন্তু সেবারেও তিনি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হননি।

তিনি আবু সহল আজ-জুজাজ (রহ.) ও আবুল হাসান আল-কারখী (রহ.)-এর নিকট ফিকহশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ৩২৫ হিজরীতে বাগদাদ নগরে প্রবেশ করেন। পরে আহওয়াজ চলে যান এবং পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন। পরে তাঁর শিক্ষক ও শায়খ আবুল হাসান আল-কারখী (রহ.)-এর মত ও পরামর্শক্রমে নিশাপুরের শাসকের সঙ্গে নিশাপুর চলে যান। তিনি নিশাপুরে থাকাকালে আবুল হাসান আল-কারখী (রহ.) ইন্তিকাল করেন। তাই ৩৪৪ হিজরীতে তিনি আবার বাগদাদে চলে আসেন।

বিপুলসংখ্যক লোক তাঁর নিকট ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-জুরজানী (রহ.) যিনি ইমাম আবুল হাসান আল-কুদুরী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন এবং আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-জাফরানী (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল বাকী ইবনে কানে (রহ.)-এর নিকট থেকে। কুরআনের আহকাম-বিধি বিধান পর্যায়েও তাঁর নিকট থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বহু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। খতীব বাগদাদী (রহ.)-এর মতে তিনি ৩৭০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

এ জীবনী লেখকের বক্তব্য হল, একাধিক ব্যক্তিই এরূপ উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী আয-যুরকানী (রহ.) তাঁর শরহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া গ্রন্থের সপ্তম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, 'তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৩১৫ হিজরীতে। তিনি এ-ও লিখেছেন যে, আবু বকর আর-রাযী ইমাম, হাদীসের হাফিয এবং নিশাপুরস্থ হানারী ইমামগণের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি আবু হাতিম ও ওসমান আদ-দারিমীর নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন আবু আলী ও আবু আহমদ আল-

হাকিম। ইবনে উকদা বলেছেন, আবু বকর আর-রাযী (রহ.) হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি ৩১৫ হিজরীতে ইত্তিকাল করেছেন।

কাশফুয যুনুন গ্রন্থকার আহকামুল কুরআন গ্রন্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ গ্রন্থটি আল-জাস্সাস আর-রাযী অভিধায় পরিচিত মুহাম্মদ ইবনে আহমদের রচিত। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৩৭০ হিজরীতে। উসূলে ফিকহের উল্লেখ পর্যায়েও এ মৃত্যুসনেরই উল্লেখ করেছেন। আদাবুল কাযীর শরাহ লেখকদের সঙ্গেও এ মৃত্যুসনই লিখেছেন। আল-জামিউস সগীর গ্রন্থের শরাহ লেখকদের প্রসঙ্গে ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল-জাস্সাস (রহ.)-এর মৃত্যুসন ৩৭০ লিখেছেন। আল-জামিউল কবীর গ্রন্থে শরাহ প্রসঙ্গেও তাই লিখেছেন। মুখতাসার আল-করখীর শরাহ গ্রন্থাবলির উল্লেখ পর্যায়েও আবু বকর আল-জাস্সাস (রহ.)-এর মৃত্যু সন ৩৭০ হিজরী লিখেছেন।

মৃত্যুসন পর্যায়ে এ মতপার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে নামের পার্থক্যও লক্ষণীয়। কোথাও আহমদ ইবনে আলী, কোথাও মুহাম্মদ ইবনে আলী এবং কোথাও মুহাম্মদ ইবনে আহমদ লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ জীবনী লেখকের মতে প্রথমোক্ত কথাই আসল সত্য ও যথার্থ।

—সম্পাদক

বিসমিল্লাহর আহকাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী (রহ.) বলেছেন, এ গ্রন্থের পূর্বে আমি একটি ভূমিকাগ্রন্থ প্রকাশ করেছি।^১ তাতে যেসব কথা লিখিত হয়েছে তা অবশ্যই স্মরণীয়। তাতে তওহীদের মৌল নীতি, কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার উপায়-পন্থা, তার দলীলসমূহ প্রকাশকরণ, তার শব্দ থেকে পাওয়া হুকুম বা নির্দেশ-নিষেধ এবং আরবদের বাক্যের রূপ পরিবর্তন, আভিধানিক নাম ও শরীয়ত পর্যায়ে বাক্যসমূহ বোঝার জন্যে যা যা প্রয়োজন তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কেননা এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম প্রয়োজন আল্লাহর এককত্ব প্রমাণ, তার সৃষ্টির সাথে তাঁর সাদৃশ্যমুক্ততা এবং মিথ্যা অপবাদকারীরা যেসব জুলুম সম্পর্কিত কথা-বার্তা বলেছে তা থেকে তাঁকে পবিত্র প্রমাণ করা।

সেই ভূমিকা-গ্রন্থের পর এখানে সরাসরি কুরআনের বিধান পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনায় পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থে শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুম সংক্রান্ত দলীলসমূহও পেশ করা হয়েছে। এ কাজে আমি আল্লাহর নিকট তওফীক প্রার্থনা করছি যা আমাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে, আমাকে তাঁর নিকটে পৌঁছিয়ে দেবে। কেননা তিনিই তো আমার অভিভাবক, একমাত্র তিনিই তা করতে সক্ষম।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা

ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.) বলেছেন, এ বিষয়ে কয়েকটি দিক দিয়ে কথা বলতে হবে।

^১ ‘ভূমিকাগ্রন্থ’ বলে বুঝিয়েছেন তাঁর রচিত ‘উসুলে ফিকহ’ গ্রন্থ। কুরআন থেকে হুমক বের করার মৌলনীতিসমূহ তাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১. প্রথম কথা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-এর পূর্বে উহ্য শব্দের সর্বনাম সম্পর্কে। অর্থাৎ এর পূর্বে ‘আমি শুরু করছি’ বা ‘শুরু কর’ কথাটি উহ্য রয়েছে। এর কর্তা কে তা নির্ধারণ করতে হবে।
২. দ্বিতীয় بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বাক্যটি যা শুরুতেই রয়েছে তা কি কুরআনের অংশ কিংবা অন্য কিছু?
৩. তৃতীয়, তা সূরা আল-ফাতিহার অংশ কিংবা নয়?
৪. চতুর্থ, তা কি প্রত্যেকটি সূরার প্রথমেই স্থাপিত বাক্য নয়?
৫. পঞ্চম, এ বাক্যটি কি পূর্ণাঙ্গ বাক্য, না পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়?
৬. ষষ্ঠ, এ বাক্যটি নামাযেও পাঠ করতে হবে কি?
৭. সপ্তম, নামাযে যে সূরা বা কুরআনের অংশ পড়া হয়, তার শুরুতে তা বারবার পড়তে হবে কি?
৮. অষ্টম, তা উচ্চৈঃস্বর পড়তে হবে কিনা?
৯. নবম, তাতে যে তত্ত্বসমূহ নিহিত রয়েছে ও ব্যাপক তাৎপর্য সন্নিবেশিত হয়েছে তা প্রকাশ করা।

এর কারণ আরবি ভাষার নিয়মে যে বাক্যেই শুরুতে بِ অক্ষরটি রয়েছে তা একটি ক্রিয়াপদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যিক, তা উহ্য হোক, কি প্রকাশমান। উহ্য হলে ক্রিয়াপদের ضَمِيرٌ (সর্বনাম) এখানে দুটি অবস্থার যেকোনো একটি হতে হবে। হয় কাজের সংবাদদান পর্যায়ের হবে, না হয় হবে কাজের আদেশ। সংবাদদান পর্যায়ের হলে বাক্যটি হবে, اَبْدَأُ بِسْمِ اللَّهِ (আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি...)। পরে اُبْدِئْ (আমি শুরু করছি) অংশ উহ্য করা হয়েছে। এ সংবাদদানের বিশেষ আবশ্যিকতা থাকেনি, বাস্তব অবস্থা থেকেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত। আর যদি اَبْدِئْ (শুরু কর) এ শব্দটি উহ্য ধরা হয় তাহলে তার অর্থ হবে: اَبْدِئْ بِسْمِ اللَّهِ (আল্লাহর নামে পড়া শুরু কর)।

এ দুটি সম্ভাবনার যেকোনো একটি হতে পারে। সূরা পাঠ করার ধারায় মনে হয় আদেশসূচক শব্দই উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে, ‘আল্লাহর নাম নিয়ে পড়াশুনা কর’। যেমন- সূরা আল-ফাতিহার শব্দ اِيَّاكَ نَعْبُدُ (কেবলমাত্র তোমারই হে আল্লাহ আমরা ইবাদত করছি)।^১ এর পূর্বে فُؤُؤْ

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহা, ১:৪

(তোমরা বল) উহ্য ধরা হয়েছে। بِسْمِ اللَّهِ বাক্যেও এ সম্বোধন উহ্য আছে বলা যায়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছে। যেমন— اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا (তোমরা রবের নামে পড়) ^১ এখানে পাঠ শুরু করার পূর্বে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। অপর এক আয়াতে কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ বলতে আদেশ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি সংবাদদানের তাৎপর্য অনুযায়ী ‘আমি পড়া শুরু করছি’ একথা উহ্য ধরা হয়, তা হলেও তাতে আদেশ নিহিত রয়েছে মনে করা যায়। কেননা যখন জানা যাবে যে, আল্লাহ নিজেই আল্লাহর নামে পড়া শুরু করেছেন, তখন সেই আল্লাহর নামে শুরু করার জন্যে আমাদের প্রতি আদেশ করা হচ্ছে বোঝা যাবে। কেননা তার নাম করে পাঠ শুরু করলে তাতে বরকত হবে। আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমরাও যেন তাই করি।

উপর্যুক্ত দুটি তাৎপর্যের উভয়ই এখানে বৈধ মনে করাও অসমীচীন নয়। অর্থাৎ এখানে যেমন সংবাদ দেওয়া হয়েছে তেমনি তা করার আদেশও করা হচ্ছে। শব্দের গঠনপ্রণালীতে এ দুটিরই সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান।

কেউ বলতে পারেন, সংবাদদানের কথা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে উভয় তাৎপর্য একসাথে গ্রহণ করার অবকাশ থাকত না।

জবাবে বলা যায়, হ্যাঁ সংবাদদানের ভাবটি (অর্থাৎ ‘আমি শুরু করছি’ কথা) স্পষ্ট উল্লিখিত হলে দুটি তাৎপর্য একসাথে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। কেননা একটি শব্দ থেকে একই সময় আদেশ ও সংবাদদান উভয় তাৎপর্য গ্রহণ করার অবকাশ থাকতো না। কেননা সংবাদদান বোঝা গেলে প্রকৃতপক্ষেও তাই হতো। একটি শব্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থ একই সময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা প্রকৃত অর্থ তো তাই, যে অর্থে শব্দটি মূলতই ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরোক্ষ অর্থ প্রকৃত অর্থকে বাদ দিয়ে অন্যদিকে লক্ষ্য দিলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আর একই সময় ও একই অবস্থায় যথাযথ ব্যবহৃত অর্থ এবং তা বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া একটি শব্দের দ্বারা সংবাদদান ও আদেশদান উভয় তাৎপর্য গ্রহণ নিষিদ্ধ কাজ। সর্বনাম এখানে উহ্য, অনুল্লিখিত। ইচ্ছার শব্দে দুটিরই সম্ভাবনা থেকে থাকলে উভয় অর্থ গ্রহণ কঠিন নয়। তখন তার অর্থ হবে, আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। অর্থাৎ এ লাভের লক্ষ্যে আল্লাহর নামে শুরু কর।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আলাক, ৯৬:১

এ দুটিরই ইচ্ছা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণভাবে ও নিঃশর্তে এ দুটিরই দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া জরুরি নয়। কেননা তা শব্দের সাধারণ তাৎপর্যের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। কোন অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেক সম্ভাব্য দুটি দিকের কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে নবী করীম (সা.)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন,

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا أُسْتُكِرْهُوا عَلَيْهِ».

[১] ‘অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভুল করা ও ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃতি এবং কোনো কাজ জোরপূর্বক করতে বাধ্য করার দরুন কৃত কাজের দায়িত্ব আমার উম্মতের ওপর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ এ ৩টি পর্যায়ে কাজের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।)’^১

কেননা যে হুকুম সর্বনাশের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেখানে মূল হুকুমটাই উঠে যাওয়ার আশঙ্কা, গোনাহ হওয়ারও আশঙ্কা, সেখানে এ দুটিই একসাথে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। এভাবে যে, সে কাজের বাধ্যবাধকতা যেমন আমার উম্মতের ওপর নেই তেমনি তাতে আল্লাহর নিকট কোনো গোনাহও হবে না। কেননা ব্যবহৃত শব্দে এ দুটি তাৎপর্যের সম্ভাবনা রয়েছে। দুটিরই ইচ্ছা করা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে তা সত্ত্বেও তা শব্দের সাধারণত্বের দরুন নয়। তা হলে সে দুটিরই সংবদ্ধতা থাকতো। এ কারণে এ ছাড়া ভিন্নতর দলীলকে লক্ষ্য প্রমাণের জন্যে পেশ করা হয়েছে। দুটির কোনো একটি বা উভয়টিই বোঝাবার জন্য দলীল দাঁড় করা নিষিদ্ধ নয়। আর আরবি ভাষায় এ রকম হয়ে থাকে যে, দুটি সম্ভাবনার সর্বনাম ব্যবহার করা হল, যে দুটির এক সাথে ইচ্ছা করা সঠিক কাজ নয়। যেমন— নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

[২] ‘কাজসমূহ নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট।’^২

জানাই আছে যে, এখানে যে সর্বনাম উহ্য আছে তা কাজের বৈধতা প্রমাণ করে যেমন, তেমনি কাজটির আফযালিয়ত—অতীব উত্তম হওয়ার কথাও প্রকাশ করে। তাই যখন বৈধতার অর্থ গ্রহণ করা হবে, তখন ‘কাজের অতীব উত্তম হওয়ার’ তাৎপর্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে। কেননা বৈধতার ইচ্ছা নিয়ত

^১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৬৫৯, হাদীস: ২০৪৫, তাঁর ভাষ্য হচ্ছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا أُسْتُكِرْهُوا عَلَيْهِ»

^২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৬, হাদীস: ১; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৫১৫, হাদীস: ১৫৫ (১৯০৭), হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত

না হওয়া অবস্থায় তার হুকুম প্রমাণিত হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর অতীব উত্তম হওয়ার ইচ্ছা গ্রহণ দাবি করে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো ইতিবাচক হুকুম প্রমাণ করা হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। তা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হোক, কি অতীব উত্তম হওয়ার নিষেধের মধ্যে হোক। আর একই অবস্থায় মূল অস্বীকার করা ও পূর্ণত্বকে অস্বীকার করার ইচ্ছা করা সম্ভব নয়। যে অবস্থায় দুটি তাৎপর্যের ইচ্ছা করা মূলকে অস্বীকার করা ও ক্ষতিকে প্রমাণ করা সहीহ হয় না, উক্ত কথা সেই পর্যায়ে। উভয়টির ইচ্ছা প্রমাণ করতে চাওয়া সहीহ নয়।

ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.) বলেছেন, আদেশের তাৎপর্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রমাণিত হলে তখন তা বিভক্ত হয়ে যাবে, হয় ফরয হবে কিংবা হবে নফল। ফরয হচ্ছে নামায শুরু করার সময়ে আল্লাহর স্মরণ করা। যেমন— কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

‘নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে পরিশুদ্ধতা পবিত্রতা গ্রহণ করল এবং তার রবের নাম উল্লেখ করে নামায কায়েম করল।’^১

আয়াতে আল্লাহর নামে উল্লেখ বা স্মরণ করার পর নামায কায়েমের কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল, এখানে তাকবীরে তাহরীমা—নামাযের সূচনাকালীন হাত তুলে اللهُ أَكْبَرُ বলার কথা বলা হয়েছে। (একবার হাত তোলা সূনাত)।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذْ كَرَّمَاسْمُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبَتُّلًا ۝

‘তোমরা রবের নামের যিকর—স্মরণ করতে থাক ও সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে তাঁরই দিকে মনোযোগী হয়ে থাক।’^২

বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ [الفتح]، قَالَ: هِيَ

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

[৩] ‘ইমাম যুহরী’ (রহ.)-এর মতে এ আয়াতেও তাকবীরে তাহরীমার কথাই বলা হয়েছে, (এবং) وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আ’লা, ৮৭:১৪-১৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযায্মিল, ৭৩:৮

^৩ আয-যুহরী: আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওবাইদুল্লাহ ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.)

মুমিনদেরকে তাকওয়ার নীতির অনুসারী বানিয়ে রাখলেন)।^১

আল্লাহর এ বাণীর অর্থ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলতে অভ্যস্ত করা।^২

জস্তু যবেহ করা কালেও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ফরয। আল্লাহ নিজেই তার তাগিদ করেছেন। বলেছেন,

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۝

‘কাতার বাঁধা অবস্থায় জস্তুগুলোর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।’^৩

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّكُمْ لَفِشْقٌ ۝

‘যে জস্তু যবেহ করাকালে আল্লাহর নাম বলা হয়নি তা খেয়ো না। কেননা এ কাজটি ফাসিকী, ইসলামের সীমালঙ্ঘন।’^৪

এক কথায় তাহারাত, খাওয়া, পান করা ও যাবতীয় কাজ শুরু করার পূর্বে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা নফল অর্থাৎ ফরয নয়।

কেউ বলতে পারেন, এ কথা বলে তো তুমি বাহ্যিকতার ওপর নির্ভর করে ও প্রতিপক্ষের দলীল গ্রাহ্য না করেই অযু করাকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করাও ওয়াজিব নয় বলে প্রমাণ করছে। অথচ রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন,

«لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».

[৪] ‘যে লোক আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে অযু করেনি তার অযুই হয়নি।’^৫

জবাবে বলতে হবে, এখানে সর্বনাম প্রকাশ্যভাবে নেই। কাজেই এর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। প্রমাণিত বলে ধরা হবে শুধু তা, যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর রাসূলে করীম (সা.)-এর উক্ত কথাটি অযুর অতীব উত্তম না হওয়ার কথা বুঝিয়েছে, দলীল থেকে তাই প্রমাণিত। আদর্শেই অযু না হওয়ার কথা বোঝায় না।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহা, ৪৮:২৬

^২ আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন, খ. ২১, পৃ. ৩১৪

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-হজ্জ, ২২:৩৬

^৪ আল-কুরআন, সূরা আল-আন‘আম, ৬:১২১

^৫ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৭, পৃ. ৪৬৩-৪৬৪, হাদীস: ১১৩৭০ ও ১১৩৭১; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৩৯৪, হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

কুরআনের আয়াত—এ পর্যায়ে আলোচনা

ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) বলেছেন, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কুরআনের একটি আয়াত। এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। সূরা আন-নামলে পূর্ণ আয়াত এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে,

إِنَّهَا مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

‘এ চিঠি সুলায়মানের নিকট থেকে এসেছে এবং তা দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করা হয়েছে।’^১

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ جَبْرِئَلَ ۞ أَوَّلَ مَا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْقُرْآنِ قَالَ لَهُ: اقْرَأْ، قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ» قَالَ لَهُ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝﴾ [العلق].

[৫] ‘হযরত জিবরীল (আ.) সর্বপ্রথমবার কুরআন নিয়ে যখন নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রথমে বললেন, اقْرَأْ (পড়)। রাসূল (সা.) বললেন, (مَا أَنَا بِقَارِئٍ) (আমি তো পড়তে সক্ষম নই)। পরে বললেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ (পড় তোমরা রব্ব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন^২)।^৩

وَرَوَى أَبُو قَطْنٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ فِي أَوَائِلِ الْكُتُبِ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ»، حَتَّى نَزَلَ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَهَا ۝﴾ [هود], فَكَتَبَ: بِسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ ۝﴾

৞ [الإسراء], فَكَتَبَ فَوْقَهُ: الرَّحْمَنُ، فَنَزَلَتْ قِصَّةُ سُلَيْمَانَ فَكَتَبَهَا حِينَئِذٍ.

[৬] ‘আবু কাতান^৪ (রহ.) আল-মাসউদী^৫ (রহ.) থেকে, তিনি আল-হারম আল-উকলী^৬ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.)

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নামল, ২৭:৩০

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আলাক, ৯৬:১

^৩ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৭, হাদীস: ৩ ও খ. ৬, পৃ. ১৭৩, হাদীস: ৪৯৫৩; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৩৯-১৪০, হাদীস: ২৫২ (১৬০), হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৪ আবু কাতান: আমর ইবনুল হায়সাম ইবনে কাতান আল-কুতায়ী আল-বাসারী (রহ.)

^৫ আল-মাসউদী: আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা আল-কুফী (রহ.)

^৬ আল-উকলী: আল-হারিস ইবনে ইয়াযীদ আল-উকলী আল-কুফী (রহ.)

চিঠিসমূহের শুরুতে প্রথমে লিখতেন, «بِسْمِكَ اللَّهُمَّ» (আমাদের আল্লাহ, তোমার নাম করে [শুরু করছি])। পরে এ আয়াত নাযিল হয়, بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُؤْسَسَهَا ۝ (আল্লাহর নাম নিয়ে [নৌকায় আরোহণ কর]), যিনি নৌকাকে চালু রাখবেন এবং শক্ত করে উঠু করে ধারণ করবেন। অতঃপর রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহ লিখাতে শুরু করেন। পরে নাযিল হল, قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۝ (বল, তোমরা আল্লাহকে ডাক কিংবা ডাক রহমানকে^২)। এরপর তিনি চিঠির ওপর আল্লাহর পর 'রহমান'ও লিখতে থাকেন। পরে হযরত সুলায়মান (আ.) সংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। তখন তিনি পূর্ণ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখতে শুরু করেন।^৩

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে,

قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَمَالِكٌ، وَقَتَادَةُ، وَثَابِتٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكْتُبْ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ» حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ التَّمْلِ.

[৭] 'শা'বী^৪ (রহ.), [৮] মালিক^৫ (রহ.), [৯] কাতাদা^৬ (রহ.) ও [১০] সাবিত^৭ (রহ.) প্রমুখ তাবেয়ী বলেছেন, নবী করীম (সা.) সূরা আন-নামল নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পত্রাদির শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখেননি।^৮

হৃদয়বিয়ার সন্ধিকালে তাঁর ও সুহায়ল ইবনে আমর এ মধ্যকার চুক্তিপত্র রচনার সময় হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-কে বললেন,

«أَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ»، فَقَالَ لَهُ سَهَيْلٌ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَإِنَّا لَا

^১ আল-কুরআন, সূরা হূদ, ১১:৪১

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:১১০

^৩ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ৭, পৃ. ২৬১, হাদীস: ৩৫৮৯০:

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ مَا كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كَتَبَ: «بِسْمِكَ اللَّهُمَّ»، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُؤْسَسَهَا ۝﴾ [মুদ]

كَتَبَ: «بِسْمِ اللَّهِ»، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ [নমল] كَتَبَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

^৪ আশ-শা'বী: আবু আমর, আমির ইবনে শাহাযীল আল-কুফী (রহ.)

^৫ মালিক: মালিক ইবনে সা'লাবা ইবনে আবু মালিক আল-কুরায়ী (রহ.)

^৬ কাতাদা: আবুল খাতাব, কাতাদা ইবনে দি'আমা ইবনে কাতাদা আস-সাদুসী আল-বাসারী (রহ.)

^৭ সাবিত: আবু মালিক, সাবিত ইবনে 'উমারা আল-হানাফী আল-বাসারী (রহ.)

^৮ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ৭৮৭

نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ.

بِاسْمِكَ, না, বলল, 'সুহাইল' লিখ। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ “প্রথমে [১১] بِاسْمِكَ (হে আল্লাহ তোমার নাম লিখেতে) হবে। কেননা আমরা রহমানকে চিনি না।”^২

নবী করীম (সা.) সুহাইলের কথা মেনে নিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বাক্যটি পূর্বে কুরআনে নাযিল হয়নি। পরে সূরা আন-নামল নাযিল হওয়ার পরই তা ব্যবহৃত হতে থাকে। (সূরাটি মক্কায হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়ার কথা সর্বসম্মত)।

বিসমিল্লাহ কি সূরা আল-ফাতিহার অংশ?

ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সূরা আল-ফাতিহার অংশ কিনা—এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। কুফাপন্থি কুরআন পাঠকবৃন্দ তা সূরা আল-ফাতিহার অংশ গণ্য করেছেন। বলেছেন, তা এ সূরার মধ্যেরই একটি আয়াত। কিন্তু বাসরাপন্থি পাঠকগণ তা গণ্য করেননি। আমাদের হানাফী ফিকহবিদদের পক্ষ থেকে এ পর্যায়ে কোনো স্পষ্ট অকাট্য মত বর্ণিত হয়নি, তা সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত তা-ও বলা হয়নি। তবে আমাদের উস্তাদ শায়খ আবুল হাসান আল-কারখী (রহ.) নামায়ে তা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ না করাই তাঁদের মত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের মতে তা সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত হতো তাহলে নামায়ে তা তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে পড়ার নীতিই গ্রহণ করতেন, যেমন সূরার অন্যান্য আয়াত পাঠ করা হয়। ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মতে তা সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত। তাই তা পাঠ করা না হলে নামায আবার পড়তে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ দুটি মতের কোনো একটিকে সহীহ বলে ঘোষণা করা মূর্খতা ও প্রচ্ছন্নতা আরোপ মাত্র। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে ইনশা আল্লাহ।

^১ সুহাইল: সুহাইল ইবনে আমার আল-মক্কী, ফতহ মক্কা বা পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

^২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৭, পৃ. ৩৫৪, হাদীস: ১৬৮০০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৪১১, হাদীস: ৯৩ (১৭৮৪), *সহীহ মুসলিম*-এর ভাষ্য হচ্ছে,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا صَلَّاهُوا النَّبِيَّ ﷺ فِيهِمْ سَهْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَلِّي: أَكْتُبُ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، قَالَ سَهْلٌ: «أَمَّا بِسْمِ اللَّهِ، فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنْ أَكْتُبُ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ».

বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার প্রথমেই উল্লেখ্য কিনা

ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন, বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার শুরুতে উল্লেখ্য কোন আয়াতে কিনা—এ পর্যায়েও মনীষীদের বিভিন্ন মত রয়েছে। এ মাত্র আমরা বলে এসেছি যে, আমাদের হানাফী মনীষীদের যেহেতু তা নামাযে উচ্চস্বরে পড়ার নীতি গৃহীত হয়নি তাই তা প্রত্যেকটি সূরার শুরুতে উল্লেখ কোনো আয়াতও নয়। আর তা যখন সূরা আল-ফাতিহার অংশ নয়, তাই অন্যান্য সূরার ব্যাপারেও সেই কথা। অন্যান্যের মতে তা সূরা আল-ফাতিহার অংশ নয় বটে, তবে তা সূরা আল-ফাতিহার শুরুতে উল্লেখ্য আয়াত। কিন্তু ইমাম শাফিয়ীর মত হল তা প্রতিটি অংশ একটি আয়াত। তবে তাঁর পূর্বে এ ধরনের মত অন্য কেউ দেননি। কেননা পূর্বগামীদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তা সূরা আল-ফাতিহার আয়াত কিনা। এটি সবকয়টি সূরার আয়াত কেউ-ই মনে করেননি। তা যে সূরা আল-ফাতিহার আয়াত নয় একটি হাদীস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি হল:

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَيْنِ، فَنَضْفُهَا لِي وَنَضْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة]، قَالَ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة]، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي أَوْ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة]، قَالَ: قَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة]، قَالَ: هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيَقُولُ عَبْدِي: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة] إِلَى آخِرِهَا قَالَ: لِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

[১২] ‘সুফয়ান ইবনে উয়ায়না’ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলা ইবনে আবদুর রহমান’ (রহ.) থেকে, তিনি তাঁর পিতা’র নিকট

^১ সুফয়ান: আবু মুহাম্মদ, সুফয়ান ইবনে উয়ায়না ইবনে আবু ইমরান মায়মুন আল-হিলালী আল-কুফী আল-মক্কী (রহ.)

থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু’ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তার অর্ধেক আমার জন্য আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার জন্যে। আমার বান্দার জন্যে তা-ই আছে যা সে চেয়েছে। সে যখন الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার হামদ (প্রশংসা) করেছে। যখন সে বলে, الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে মর্যাদাবান করেছে বা আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। যখন সে বলে, مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার নিকট সবকিছু সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে, إِلَهِكَ عَبْدُكَ وَسَيِّدُكَ سَيِّدُكَ, তখন আল্লাহ বলেন, একথাটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা-ই সে পাবে। এরপর বান্দা إِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা তাই-যা সে চেয়েছে।”^৩

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ যদি সূরা আল-ফাতিহার একটি আয়াত হতো, তাহলে সূরাটির আয়াতসমূহের উল্লেখ সেটিরও উল্লেখ হতো। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সূরা আল-ফাতিহার অংশ নয়। আর একথা তো সকলেরই জানা যে, উপরে উদ্ধৃত হাদীসে সালাত বা নামাযকে দু’ভাগে ভাগ করার কথা বলে সূরা আল-ফাতিহাকেই বুঝিয়েছেন, আর তাকেই দু’ভাগ করার কথা বলেছেন। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ যে সূরা আল-ফাতিহার অংশ নয়, তা তার মধ্যকার কোনো আয়াত নয়, তা এ পরিপ্রেক্ষিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল। দুটি দিক দিয়ে কথাটির ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত উক্ত বিভক্তিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত তা এ বিভক্তিতে থাকলে তা দু’ভাবে বিভক্ত হতো না। কেননা তাতে বান্দার অংশের তুলনায় আল্লাহর অংশ অনেক বড়। এই بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ আল্লাহর গুণ বর্ণনা সমন্বিত। তাতে বান্দার কোনো অংশই নেই।

^১ আলা ইবনে আবদুর রহমান: আবু শিব্বর, আলা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াকুব আল-খুরাকী আল-মাদানী (রহ.)

^২ তাঁর পিতা: আবদুর রহমান ইবনে ইয়াকুব আল-জুহানী আল-মাদানী (রহ.)

^৩ (ক) আহমদ ইবনে হামল, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ২৩৯-২৪০, হাদীস: ৭২৯১; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৩৮ (৩৯৫)

কেউ বলতে পারেন যে, তা উল্লেখ করা হয়নি এ জন্যে যে, তাতে সূরার الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ১ দু'বার উল্লেখ করতে হয় ।

জবাবে বলা যাবে, দুটি দিক দিয়ে একথাটি ভুল । একটি এই যে, তা যখন একটি স্বতন্ত্র আয়াত যেমন বলা হয়ে থাকে তাহলে মূল সূরার যে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ রয়েছে তাকে যথেষ্ট মনে করাও বৈধ হতো । আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কথায় আল্লাহর গুণ বর্ণনা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তা আল্লাহর বিশেষ নাম, এ নামে অন্য কাউকে অভিহিত করা যেতে পারে না । এ অবস্থায় সূরাটির বিভক্তিকালে তার উল্লেখ একান্তই জরুরি ছিল । কেননা তার উল্লেখ পূর্বে হয়নি । সূরার আয়াত বিভক্তিতেও তার উল্লেখ কোনো একটি ভাগেও নেই ।

উপরে উদ্ধৃত হাদীসটি অপর এক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে,
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ،
 عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ،
 يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « قَالَ اللَّهُ: فَسَمَتِ
 الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَتْنِي، فنَضَفَهَا لِي، وَنَضَفَهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا
 سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ [الفاتحة]، فَيَقُولُ اللَّهُ: حَمْدِي
 عَبْدِي، فَيَقُولُ: ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ ﴾ [الفاتحة]، يَقُولُ اللَّهُ: أَتْنِي عَلَى عَبْدِي،
 يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ ﴾ [الفاتحة]، يَقُولُ اللَّهُ: مَجْدَنِي عَبْدِي، وَهَذِهِ
 الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ عَبُدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ ﴾ [الفاتحة]،
 يَقُولُ اللَّهُ: فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

[১৩] মুহাম্মদ ইবনে বকর^১ (রহ.) ইমাম আবু দাউদ^২ (রহ.) থেকে
 বর্ণনা করেছেন, তিনি কা'নাবী^৩ (রহ.) থেকে, তিনি ইমাম মালিক^৪

^১ মুহাম্মদ ইবনে বকর: আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রাযযাক ইবনে দাসা আল-বাসারী আত-তাম্মার (রহ.)

^২ ইমাম আবু দাউদ: আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (রহ.)

^৩ আল-কা'নাবী: আবু আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা ইবনে কা'নাব আল-বাসারী (রহ.)

(রহ.) থেকে, তিনি আলা ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হিশাম ইবনে যুহরার মুক্ত গোলাম আবুস সাযিব^২ (রহ.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ বলেছেন, নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই খণ্ড বিভক্ত করা হয়েছে, তার অর্ধেক আমার আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে অবশ্যই পাবে। বান্দা বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার হামদ বর্ণনা করেছে। বান্দা বলে, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা বলে, مِلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদার কথা বলেছে। আর এ আয়াত আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। বান্দা বলে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ, আর এ আয়াত আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। বান্দার তা-ই রয়েছে যা সে চেয়েছে।”^৩

১. ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেন, এ হাদীসে অতঃপর مِلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যায়ে বলা হয়েছে, এ আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু’ভাগে বিভক্ত। এটা বর্ণনাকারীর একটি ভ্রান্তি মাত্র। কেননা مِلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ একান্তভাবে আল্লাহর গুণবর্ণনা, এতে বান্দার কিছু নেই। যেমন— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এ বান্দার ভাগের কিছু নেই। اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ-এ আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অংশ আছে তা বলার কারণ হল, তাতে একদিকে যেমন আল্লাহর গুণের উল্লেখ আছে, তেমনি আছে বান্দার প্রার্থনা। লক্ষণীয় যে, এর পরবর্তীকালে আল্লাহর কথা: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-এ বিশেষভাবে বান্দার অংশ বলা হয়েছে এজন্যে যে, তাতে আল্লাহ সম্পর্কিত কোনো কথা নেই। এটা বান্দার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনামাত্র। অপর দিক থেকে مِلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এবং অনুরূপভাবে

^১ ইমাম মালিক: ইমামে দারুল হিজরা, আবু আবদুল্লাহ, মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিমযারী (রহ.)

^২ আবুস সাযিব: আবুস সাযিব আল-আনসারী (রহ.)

^৩ (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৯৪, হাদীস: ২৪৫; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১৬-২১৭, হাদীস: ৮২১; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২০১-২০২, হাদীস: ২৩৫৩; (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৯০৯

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ যদি আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে বিভক্ত হতো, তাহলে তা দু'ভাগে বিভক্ত হতো, যারা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কে সূরার একটি আয়াত গণ্য করে তারা যেমন বলে। তাহলে আল্লাহর জন্যে ৪টি আয়াত হয়ে যেতো আর الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ঢ় বাদে। আর বান্দার জন্যে হতো মাত্র ৩টি আয়াত।

২. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সূরাসমূহের প্রাথমিক আয়াত না হওয়ার আর একটি প্রমাণ হল তা দুটি সূরার মধ্যে প্রার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যমমাত্র। যেমন—

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ لِعُمْتَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنَ الْمَثْنَيْنِ، وَإِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثْنَيْنِ، فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»؟ قَالَ عُمْتَانُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْآيَاتُ فَيَدْعُو بَعْضُ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ فَيَقُولُ: «ضَعْ هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا»، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْآيَاتُ، فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكَانَتْ الْأَنْفَالُ مِنَ أَوَّلِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

[১৪] ‘মুহাম্মদ ইবনে বকর (রহ.) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনে আউন’ (রহ.) বলেছেন, হুশাইম^২ (রহ.) আউফ আল-আ’রাবী^৩ (রহ.) থেকে বর্ণনা

^১ আমর ইবনে আওন: আবু ওসমান, আমর ইবনে আওন ইবনে আউস আল-বাযযায আল-মিসরী (রহ.)

^২ হুশাইম: হুশাইম ইবনে বশীর ইবনুল কাসিম ইবনে দীনার আস-সালামী (রহ.)

^৩ আউফ আল-আ’রাবী: ইয়াযীদ আল-ফারসী আল-বাসারী (রহ.)

করেছেন, ইয়াযীদ আল-কারী^১ (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি, আমি হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাযি.)-কে বললাম, সূরা বারায়াত (সূরা আত-তওবা) ২০০ আয়াত সমন্বিত, সূরা আল-আনফাল মাসানীর মধ্যে গণ্য, এ দুটিকে আপনারা ৭টি সুদীর্ঘ সূরার মধ্যে গণ্য করেছেন এবং দুটির মধ্যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লিখেননি, তার কারণ কি? জবাবে হযরত ওসমান (রাযি.) বললেন, নবী করীম (সা.)-এর প্রতি যখন বহু কয়টি আয়াত একসঙ্গে নাযিল হতো, তখন তিনি নিয়োজিত লেখককে ডেকে বলতেন, ‘এ আয়াত অমুক সূরায়... যাতে এই এই কথা বলা হয়েছে शामिल কর।’ আর যখন একটি বা দুটি আয়াত নাযিল হতো তখনও এরূপ বলতেন। সূলা আল-আনফাল মদীনায় প্রথম নাযিল হয়েছিল, আর সূরা বারায়াত কুরআনের শেষ সূরা হিসেবে নাযিল হয়েছিল। আর এ দুটি সূরার আলোচ্য সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আমি মনে করেছি, এ সূরাটি ওটির-ই অংশ। এ কারণেই আমি এ দুটিকে সুদীর্ঘ ৭ সূরার মধ্যে গণ্য করেছি, এ দুটির মধ্যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ছত্রটি লিখিনি।^২

বোঝা গেল হযরত উসমান (রাযি.)-কে সূরার অংশ গণ্য করেননি, তিনি তা দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যেই লিখতেন মাত্র। এছাড়া অন্য কিছু নয়। উপরন্তু তা যদি প্রত্যেক সূরার অংশ হতো, অংশ হতো সূরা আল-ফাতিহার, তাহলে তা নবী করীম (সা.)-এর স্থাপন নীতি থেকেই জানা যেতো, যেমন সব সূরার আয়াতসমূহের স্থাপন থেকেই তা জানা যায় এবং তাতে কোনোরূপ মতপার্থক্যেরই সৃষ্টি হতো না। কেননা সকল আয়াত সম্পর্কে জানার এবং এ সম্পর্কে জানার এবং এ সম্পর্কেও যথার্থ জ্ঞানের উৎস তো একটাই। সকলের মিলিত উদ্ধৃতি ও বর্ণনা হল কুরআন প্রমাণের একটি মাত্র উপায়। তাই আয়াতের স্থান ও বিন্যাস পর্যায়ে জ্ঞানও সেই একই সূত্র

^১ ইয়াযীদ আল-কারী: আওফ ইবনে আবু জামীলা আল-আ'রাবী আল-আবদী আল-বাসারী (রহ.)

^২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৪৫৯-৪৬০, হাদীস: ৩৯৯ ও পৃ. ৫২৯-৫৩০, হাদীস: ৪৯৯; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২০৮-২০৯, হাদীস: ৭৮৬; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি' উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২৭২-২৭৩, হাদীস: ৩০৮৬

থেকে জানতে হবে। কুরআন আয়াতসমূহের বিন্যাস পর্যায়ে জ্ঞানও সেই একই সূত্র থেকে জানতে হবে। কুরআনের আয়াতসমূহের বিন্যাস ভঙ্গ করা ও কোনো আয়াতকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে উঠিয়ে অন্য স্থানে বসানো যেকারোর জন্যেই জায়েয নয় সেকথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কেউ তা করলে সে তো মূল কুরআনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করল। তাই بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সূরাসমূহের প্রথম আয়াত যদি হতো তাহলে সেকথা সকলেই জানতে পারতেন, তা নিয়ে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হতো না। যেমন সকলেই জানেন যে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ একটি আয়াত হিসেবে সূরা আন-নামলে শামিল রয়েছে। কিন্তু তার অপর কোনো সূরার অংশ বা আয়াত হওয়ার কথা যখন পর্ববর্তী মনীষীরা উল্লেখ করেননি, তখন আমাদের পক্ষে তা মনে করা কোনোক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তাকে প্রত্যেকটি সূরার প্রথম আয়াতও আমরা মনে করতে পারি না।

কেউ বলতে পারেন, পূর্ববর্তীরা সব একত্রিত হয়ে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে একথা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যে, সহীফার মধ্যে যা-ই আছে তা সবই কুরআন। তাই সহীফার যেখানে যা যেভাবেই আছে সেভাবেই তা আমাদের মনে নেওয়া উচিত। জবাবে বলব, তাঁরা সূরাসমূহের উপর তা লিখিতভাবে আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন, কিন্তু তা এসব সূরার কোনোটির অংশ—সূরা আন-নামল ছাড়া দেখাননি। যে যে সূরার উপর তা লিখিত তা সেই সূরার অংশ বা একটি আয়াত, তা নিয়েই আমাদের মধ্যে এই বিতর্ক। আমরা বলি, তা কুরআনের আয়াত বটে; কিন্তু যে যে সূরার উপর তা বসানো আছে তা সেই সূরার অংশ তা আমরা বলতে পারি না। তা সেই সূরার সঙ্গে পড়তে হবে, তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তা সেই সূরার আয়াত। কেননা কুরআনের কতক অংশ অপর কতক অংশের সাথে মিলিত, সম্পর্কিত। কিন্তু بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কোন সূরার সাথে মিলিত সম্পর্কিত, তা বলা হয়নি। আর তার দরফত এটাও প্রমাণিত হয় না যে, এ সবটাই একটি সূরা।

কেউ যদি বলেন, সহীফা আমাদের নিকট আনা হয়েছে, বলা হয়েছে, তাতে যা-ই আছে, তা সবই কুরআন, তার সংবদ্ধতা-সংলগ্নতা ও বিন্যাস সহকারে। এ অবস্থায় প্রত্যেক সূরার উপর যে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ মূল সূরার অংশ না হলে তাঁরা অবশ্যই বলতেন। তাঁরা বলেছেন যে, তা প্রত্যেক সূরার ওপর বসানো হয়েছে সূরা দুটি মিলে এক হয়ে না যায় সেজন্য।

জবাবে বলা যায়, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কুরআনের অংশ নয় যারা বলে, তাদের প্রতিই এই প্রশ্ন হতে পারে। যারা বলে তা কুরআনের কথা, তাদের প্রতি এই প্রশ্ন অবান্তর। কেউ যদি বলে যে, তা যদি সূরার অংশ না হতো তাহলে তা সকলেই জানতে পারতেন, কারোরই ভিন্নমত হতো না। তাহলে যারা বলেন, তা সূরার অংশ তাদের প্রতিও এই প্রশ্ন হতে পারে না।

তাকে বলা যাবে, না, তা জরুরি নয়। কেননা যা সূরার অংশ নয়, তা সব বলে দেওয়া কর্তব্য নয়, যেমন যা কুরআনের নয় তা চিহ্নিত করে দেওয়া তাদের কর্তব্য নয়। যা সূরার অংশ তা উদ্ধৃত করাই তাদের দায়িত্ব। বলা কর্তব্য যে, এটা সূরার অংশ। যা কুরআনের, তা বলে দেওয়া যেমন তাদের কর্তব্য। তাই তা সূরার অংশ একথা যখন বলা হয়নি এবং তা নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তখন মূল কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো তাও প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের জায়েয নয়।

৩. তা সূরাসমূহের প্রথম আয়াত নয়—এ কথা প্রমাণের আর একটি দলীল হচ্ছে অপর একটি হাদীস:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
عَبَّاسِ الْجَشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «سُورَةٌ فِي
الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: ﴿تَبَرَكَ الَّذِي يَبْدِئُ
الْمُلُوكَ﴾ [الملك].»

[১৫] ‘মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আবান (রহ.) বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আইয়ুব’ (রহ.) থেকে, তিনি মুসাদ্দাদ^২ (রহ.) থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ^৩ (রহ.) থেকে, তিনি শু’বা^৪ (রহ.) থেকে, তিনি কাতাদা (রহ.) থেকে, তিনি আব্বাস আল-

^১ মুহাম্মদ ইবনে আইয়ুব: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে যুরাইস আল-বাজালী আর-রাযী (রহ.)

^২ মুসাদ্দাস: আবুল হাসান, মুসাদ্দাস ইবনে মুসারহাদ ইবনে মুসারবাল আল-আসাদী আল-বাসারী (রহ.)

^৩ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ: আবু সাঈদ আল-আহওয়াল, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে ফারুখ আল-কাতান আত-তায়মী আল-বাসারী (রহ.)

^৪ শু’বা: শু’বা ইবনুল হাজ্জাজ ইবনুল ওয়ারদ আল-আযদী আল-আতাকী (রহ.)

জুশামী^১ (রহ.), হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘কুরআনে ৩০টি আয়াত সমন্বিত সূরা তার পাঠকের জন্যে শাফাআত করবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যের কর্তা আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেবেন।’^২

কুরআনের সব কারীই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যে ৩০টি আয়াতের কথা বলা হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ গণ্য নয়। যদি তা গণ্য হতো তাহলে তো ৩০টি না, ৩১টি আয়াত হয়ে যাবে। তা হলে তা রাসূল করীম (সা.)-এর কথার বিপরীত হয়ে যাবে। উপরন্তু সমস্ত দেশ ও নগরের কারী এবং ফিকহবিদ একমত হয়ে বলেছেন, সূরা আল-কাউসার ও আয়াতবিশিষ্ট, সূরা আল-ইখলাসের মাত্র ৪টি আয়াত। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ যদি সূরার আয়াত গণ্য হতো তাহলে এ দুটি সূরার আয়াত সংখ্যা একটি করে বেশি ধরতে হতো, তা ধরা হয়নি। যদি বলা হয় যে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কে বাদ দিয়েই এই সংখ্যা ধরা হয়েছে, কেননা তাদের নিকট এটা কোনো সমস্যা নয়। আমরা বলব, তাহলে তাদের পক্ষে একথা বলা জায়েয ছিল না যে, সূরা আল-ইখলাস ৪ আয়াতবিশিষ্ট এবং সূরা আল-কাউসার ৩ আয়াতবিশিষ্ট। ৩ বা ৪ আয়াত বললে সম্পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় না। আর তা-ই যদি হতো তাহলে সূরা আল-ফাতিহার ৬টি আয়াত বলা উচিত ছিল।

ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাস (রহ.) বলেছেন,

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي جَلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة] سَبْعُ آيَاتٍ إِحْدَاهُنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

[১৬] ‘আবদুল হামীদ ইবনে জাফর’ (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি নূহ ইবনে আবু জালাল^৪ (রহ.) থেকে, তিনি সাঈদ আল-মাকবুরী’ (রহ.)

^১ আব্বাস আল-জুশামী: আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ অথবা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল-জুশামী (রহ.)

^২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৩, হাদীস: ৭৯৭৫ ও খ. ১৪, পৃ. ২৮-২৯, হাদীস: ৮২৭৬; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১২৪৪, হাদীস: ৩৭৮৬; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৫৭, হাদীস: ১৪০০; (ঘ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ২৮৯১

^৩ আবদুল হামীদ ইবনে জাফর: আবদুল হামীদ ইবনে জাফর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম ইবনে রাফি’ আল-আনসারী আল-মাদানী (রহ.)

^৪ নূহ ইবনে আবু জালাল: নূহ ইবনে আবু জালাল আল-মাদানী (রহ.)

(রহ.) থেকে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা.) বলছিলেন, সূরা আল-ফাতিহার ৭ আয়াত, তার একটি হচ্ছে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^২

এ সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রহ.)-এর উল্লেখ অনেকেই সন্দেহ করেছেন।

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي جَلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا قَرَأْتُمْ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة] فَاقْرَءُوا ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا».

[১৭] ‘আবু বকর আল-হানাফী° (রহ.) আবদুল হামীদ ইবনে জাফর (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নূহ ইবনে আবু জালাল (রহ.) থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (রহ.) থেকে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়বে, তখন তোমরা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ও পড়বে। কেননা তা সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত।’^৪

ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.) বলেছেন, অতঃপর আমি নূহ ইবনে আবু জালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন সাইদ আল-মাকবুরী (রহ.) থেকে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা শোনালেন। কিন্তু কথাটি রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন তা উল্লেখ করেননি। উক্ত হাদীসটির সনদে এমনি ভাবেরই পার্থক্য রয়েছে। তা রাসূলের কথা হওয়ায়ও মতপার্থক্য রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি মূলতই মযবুত বা শক্তভিত্তিক নয়। তাই তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না, যে রাসূল নিজেই بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কে সূরা আল-ফাতিহার আয়াত বলেছেন। তবুও তা রাসূলে করীম (সা.)-এর কথা হওয়াটা অসম্ভব নয়। কেননা তা হযরত

^১ সাঈদ আল-মাকবুরী: আবু সাঈদ, সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ কায়সান আল-লায়সী আল-মাকবুরী আল-মাদানী (রহ.)

^২ আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬৭, হাদীস: ২৩৮৯

^৩ আবু বকর আল-হানাফী: আবু বকর, আবদুল কবীর ইবনে আবদুল মজীদ ইবনে ওবাইদুল্লাহ আল-হানাফী (রহ.)

^৪ (ক) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ১১৯০; (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬৭, হাদীস: ২৩৯০

আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর কথা অনুযায়ী সূরা আল-ফাতিহারই একটি আয়াত। তার কারণ বর্ণনা ও নিজের কথার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। হাদীসের বর্ণনায় এরূপ ঘটনা কিছুমাত্র বিরল নয়। তাই যে হাদীসে এরূপ হওয়ার আশঙ্কা তা রাসূল (সা.)-এর কথা বলে চালিয়ে দেওয়া সঠিক কাজ নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) নিজেই এরূপ বলেছেন। কেননা তিনি (নবী করীম [সা.]) উচ্চস্বরে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি হয়তো মনে করে নিয়েছেন যে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সূরা আল-ফাতিহারই অংশ।

তা সত্ত্বেও যদি প্রমাণিত হয় যে, এ হাদীসের সনদে উলটা-পালটা অবস্থানেই রাসূল (সা.)-এর কথা হওয়ার ব্যাপারেও মতপার্থক্য নেই এবং তা হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর কথা, এ সন্দেহও দূর হয়ে যায়, তবুও بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কে সূরার অংশ বলা আমাদের জন্য জায়েয নয়। কেননা তা কেবল তখনই বলা যেত যদি মুসলিম উম্মতের নিকট থেকে পূর্ব থেকেই সেরূপ বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়ে আসতো, আর ইতঃপূর্বেই বলেছি যে, তা হয়নি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কোনো আয়াত কিনা এ পর্যায়ে কথা হল, তা যে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয় এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। সূরা আন-নামলে এটি একটি অসম্পূর্ণ আয়াত বা একটি পূর্ণ আয়াতের অংশমাত্র। এর প্রথমাংশে হচ্ছে, إِنَّكَ مِنْ سُلَيْمٍ (এ চিঠি সুলায়মানের নিকট থেকে এসেছে)^১। তবে সূরা আন-নামলে তা একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত না হলেও অপর কোনো সূরায় তা পূর্ণ আয়াত হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। কেননা কুরআনে এরূপ আরও পাওয়া যায়। সূরা আল-ফাতিহায় الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রয়েছে এবং তা পূর্ণাঙ্গ আয়াত হিসেবেই রয়েছে। তা সত্ত্বেও بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়, একথা সর্ববাদীসম্মত। অনুরূপভাবে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ সূরা আল-ফাতিহায় একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত, কিন্তু وَإِخْرُودُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (এবং তাদের শেষ দুআ হচ্ছে, সমস্ত তা'রীফ সারে জাহানের মালিক আল্লাহর জন্যে)^২-এ আয়াতের অংশমাত্র। অবস্থা যখন এই, তখন তার কোনো কোনো সূরার আয়াতের অংশ হওয়া সম্ভব অথবা কথিতভাবে কোনো আয়াত হতে পারে। আমরা ইতঃপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, তা সূরা আল-ফাতিহার কোনো

^১ আল-কুরআন, সূরা আন-নামল, ২৭:৩০

^২ আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, ১০:১০

আয়াত নয়। তাহলে সূরা আন-নমল ছাড়া কুরআনের কোনো পূর্ণাঙ্গ আয়াত হতে পারে। কেননা সূরা আন-নামলে তো তা কোনো পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়। একটি হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, তা একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত:

رَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ فَعَدَّهَا آيَةً.

[১৮] ‘ইবনে আবু মুলাইকা’ (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (সা.) নামাযে কুরআত পাঠ করলেন এবং তিনি তা একটি আয়াত বলে অভিহিত করলেন।^২

অন্য কথায়,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُدُّ   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   آيَةً فَاصِلَةً. رَوَاهُ الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عِكْرَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[১৯] ‘নবী করীম (সা.) - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   -কে একটি বিচ্ছিন্নকারী আয়াত গণ্য করতেন। এ হাদীসটি হায়সাম ইবনে খালিদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইকরামা (রহ.) থেকে, আমর ইবনে হারুন^৩ (রহ.) থেকে, আবু মুলাইকা (রহ.) থেকে, হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।^৪

وَرَوَى أُسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   آيَةً.

^১ ইবনে আবু মুলাইকা: আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুদ‘আন, যুহাইর আল-কুরাশী আত-তায়মী (রহ.)

^২ (ক) ইবনে খুযায়মা, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৪৯৩; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ৮৪৮; (গ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬৬, হাদীস: ২৩৮৫

^৩ আমর ইবনে হারুন: আবু হাফস, আমর ইবনে হারুন ইবনে ইয়াযীদ (রহ.)

^৪ (ক) ইবনে খুযায়মা, *আস-সহীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৪৯৩; (খ) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৭৬, হাদীস: ১১৭৫

[২০] ‘আসবাত’ (রহ.) সুদী^২ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদু খায়ব^৩ (রহ.) থেকে, হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কে একটি আয়াত গণ্য করতেন।^৪

[২১] ‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।^৫

وَرَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أَخْبِرَكَ بِآيَةٍ أَوْ سُورَةٍ لَمْ
تَنْزِلْ عَلَى نَبِيِّ بَعْدِ سُلَيْمَانَ ﷺ غَيْرِي»، فَمَشَى، وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ
الْمَسْجِدِ، وَأَخْرَجَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ مِنْ أُسْكُفَةِ الْبَابِ وَبَقِيَتْ الرَّجُلُ
الْأُخْرَى، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «بِأَيِّ شَيْءٍ تَفْتَتِحُ الْقُرْآنَ إِذَا افْتَتَحْتَ
الصَّلَاةَ؟» فَقُلْتُ: بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ.

[২২] আবদুল করীম আবু উমাইয়া আল-বাসরী^৬ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনে আবু বুরদা^৭ (রহ.) থেকে, তিনি তাঁর^৮ পিতা থেকে বর্ণনা

^১ আসবাত: আবু ইউসুফ বা আবু নসর, আসবাত ইবনে নসর আল-হামদানী (রহ.)

^২ সুদী: আবু মুহাম্মদ, ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু করীমা আস-সুদী আল-কুফী (রহ.)

^৩ আবদু খায়র: আবু উমারা আবদু খায়র ইবনে ইয়াযীদ আল-হামদানী আল-খায়ওয়ানী (রহ.)

^৪ (ক) আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৭, হাদীস: ১১৯৪; (খ) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ২৩৮৮:

عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ ﷺ، عَنِ السَّبْعِ الْمُتَنَانِي، فَقَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝﴾ [الفتح: ١]، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا هِيَ سِتُّ آيَاتٍ، فَقَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ آيَةٌ.

^৫ (ক) আত-তাহাওয়া, শরহ মা’ আনিয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ১১৯২; (খ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ৭৩৭, হাদীস: ২০২২; (খ) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ৬৬, হাদীস: ২৩৮৭:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَافِي ۝﴾ [الحجر: ١]، قَالَ: فَاتَّخَذْتُ الْكِتَابَ، ثُمَّ قَرَأْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝﴾، وَقَالَ: هِيَ الْآيَةُ السَّابِعَةُ.

^৬ আবদুল করীম: আবু উমাইয়া আল-মু’আল্লিম, আবদুল করীম ইবনে আবুল মুখারিক আল-বাসরী (রহ.)

^৭ ইবনে আবু বুরদা: আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা ইবনুল হুসাইব আল-আসলামী (রহ.)

^৮ তাঁর পিতা: আবু সাহল, বুরাইদা ইবনুল হুসাইব ইবনে আবদুল্লাহ আল-আসলামী (রাযি.)

করেছেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে এমন একটি আয়াত বা সূরা জানিয়ে দেব, যা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পর আমার ছাড়া অন্য কোনো নবীর প্রতি নাযিল হয়নি।’ অতঃপর তিনি ওঠে বলতে লাগলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং তাঁর একটি পা দরজার বাইরে রাখলেন, আর একটি পা ভেতরে ছিল, তখন আমার প্রতি মুখ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি পড়ে কুরআন পড়া শুরু কর যখন নামায পড়তে শুরু কর?’ বললাম, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে। অতঃপর তিনি বের হয়ে গেলেন।^১

ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.) বলেছেন, এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, তা একটি আয়াত বটে, কেননা তার একটি আয়াত না হওয়া পর্যায় হাদীসসমূহের এ হাদীসটির কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই।

কেউ যদি বলেন, খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে তাকে একটি আয়াত প্রমাণ করতে চেষ্টা না করাই বরং তোমার কতর্ব্য। তা-ই তো তোমার মূল দাবি। কেননা তুমি আগেই বলেছ যে, সূরাসমূহের ওপর লিখিত بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সূরার কোনো আয়াত নয়।

তাহলে তার জবাবে বলা যাবে, আয়াতের খণ্ড সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে উম্মতকে নির্ধারণ নীতি দেওয়ার পূর্বে তা জরুরি নয়, তাই খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে তাকে একটি আয়াত প্রমাণ করা সম্পূর্ণ জায়েয।^২ তবে সূরার মধ্যে তার স্থান হওয়া তাকে কুরআনের জিনিস প্রমাণ করার মতোই, তার উপায় একমাত্র মুতাওয়াতিহ হাদীস, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তা প্রমাণ করা জায়েয নয়। অন্যান্য সূরার ন্যায় শুধু কিয়াস করেও তা বলা যেতে পারে না। সূরা আন-নামলের তা আছে বলে অন্যান্য সূরাও আয়াত হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

লক্ষণীয়, নবী করীম (সা.) আয়াতের স্থান নির্ধারণ (تَوْفِيفٌ)-এর কাজ সম্পন্ন করেছেন। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হযরত

^১ (ক) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৮০-৮১, হাদীস: ১১৮৩; (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ১০, পৃ. ১০৬-১০৭, হাদীস: ২০০২৩

^২ গ্রন্থকারের বক্তব্য হচ্ছে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ যে একটি পূর্ণ আয়াত প্রমাণ করা জায়েয। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা তার কুরআনী হওয়ার কথা গ্রন্থকারের বক্তব্য নয়।

ওসমান (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে আমরা এর উল্লেখ করেছি। সব আয়াতের শুরু ও পরিমাণের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে **تَوْقِيفٌ** পাওয়া যায়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ আমাদের কর্তব্যভুক্ত নয়। আজ একথা প্রমাণিত হল যে, তা একটি আয়াত, তখন কুরআনের যেখানেই তা লিখিত আছে সেখানেই তা একটি আয়াত অবশ্যই হতে পারে, সূরাসমূহের প্রথম আয়াত না হলেও অথবা এসব স্থানে এককভাবে বারবার উল্লিখিত হলেও। যেমন- সমস্ত কিতাবের শুরুতে বরকতের জন্যে আল্লাহর নাম লেখা হয়। কাজেই যেখানেই তা লিখিত আছে সেখানেই তা একটি আয়াত হতে পারে। কেননা গোটা উম্মত থেকে সে রূপই চলে এসেছে যে, কুরআনে যা-ই লিখিত আছে তা-ই কুরআনের জিনিস। তার মধ্যে কোন জিনিসকে খারিজ করা হয়নি। এসব স্থানে বারবার লিখিত হওয়ার দরুনই তা কুরআনের বাইরের জিনিস হয়ে যায়নি। যেমন- **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي** সূরা আল-বাকার^১ ও সূরা আল-ইমরানে^২ উদ্ধৃত হয়েছে। আর **فَرَأَى النَّاسَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ آلِهِمُ بِالْفِتْنَةِ وَأَخْلَوْا إِلَىٰ آلِهِمْ** (কোন কারণে তোমাদের দু'জনের রবকে তোমরা অস্বীকার করতে পার), কুরআনে বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে উদ্ধৃত হয়েছে বারবার, তা একটি আয়াতের বারবার উল্লেখের কারণ নয়, **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ও তাই। নবী করীম (সা.) তাকে একটি আয়াত বলেছেন। তাই যেখানেই তা উল্লিখিত তা উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেই তা একটি আয়াত গণ্য হবে।

নামাযে বিসমিল্লাহ পাঠ

নামাযে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পাঠ পর্যায়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রহ.), ইমাম সুফয়ান আস-সওরী (রহ.), ইমাম হাসান ইবনে সালিহ (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.), ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফিযী (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত ফিকহবিদ বলেছেন, নামাযে **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পাঠ করার পর তা অবশ্যই পড়তে হবে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পূর্বে। তবে প্রতি রাকআতে নামাযের শুরুতে সূরা শুরু করার পূর্বে তা পুনরায় পড়তে হবে কিনা সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, 'ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তা প্রতি রাকআতে সূরা আল-ফাতিহা

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকার, ২:২৫৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:২

শুরু করার সময় একবার পাঠ করতে হবে। পরবর্তী সূরা পাঠের সময় তা পুনরায় পড়তে হবে না। এ মত আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.) ও ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন, ‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত, কিরাআত শুরু করার সময় প্রত্যেক রাকআতের প্রথম দিকে যখন একবার পড়া হবে, তখন সেই নামাযে সালাম ফেরানো পর্যন্ত তা আর পড়তে হবে না। তবে প্রত্যেক সূরা পাঠকালে তা পড়া হলে খুবই ভালো।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রহ.) বলেছেন, মসবুক হলে যে নামায ‘কাযা’ করা হবে, তাতে তা পড়তে হবে না। কেননা ইমাম তো নামাযের শুরুতে পড়ছেনই। তাই ইমামের পড়া তার জন্যেও যথেষ্ট হবে।’

ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন, একথা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কে কুরআনের অংশ মনে করেছেন কিরাআত পাঠের শুরুতে। তা শুধু বরকতের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে কুরআনের জিনিস নয়—ও যেমন সব কাজের ও লেখার শুরুতেই তা পড়া বা লেখা হয়। তা তার স্থান থেকে আলাদা করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

হিশাম ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ এবং সূরা আল-ফাতিহার পর যে সূরা পড়া হয় তার পূর্বে তা নতুন করে পড়া সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে তা পড়াই যথেষ্ট।’

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) নিজে বলেছেন, ‘প্রত্যেক রাকআতে কিরাআতের পূর্বে তা পড়বে, পরবর্তী রাকআতে সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অনুরূপ তা আবার পড়বে যখন সূরা পড়তে ইচ্ছা করবে।’

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.) বলেছেন, ‘খুব বেশি সূরা পড়লে এবং তা অনুচ্চ শব্দে পড়লে প্রত্যেক সূরার শুরুতে তা পড়বে। আর যদি উচ্চস্বরে পড়ে, তাহলে তা পড়বে না। কেননা তখন দুই সূরার মাঝে খানিকটা সময় থেকে থাকাই পার্থক্য করার জন্য যথেষ্ট।’

ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)-এর একথা থেকে বোঝা যায়, তার মতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে মাত্র কিংবা কিরাআত শুরু করার জন্যেই তা পড়তে হয়, তা সূরার অংশ নয়। তা থেকে

একথা বোঝা যায় না যে, তিনি তাকে একটি আয়াত মনে করতে এবং তা কুরআনের অংশ নয়।

ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) বলেছেন, 'তা প্রত্যেকটি সূরার প্রথমে লেখা রয়েছে। অতএব তা প্রত্যেকটি সূরা পাঠের শুরুতে পড়তে হবে।'

ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهَا تُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

[২৩] 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও [২৪] মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রতি রাকআতেই পড়তে হবে।'

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِذَا قَرَأْتَهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ أَجَزَّكَ فِيهَا بَقِيَّ.

[২৫] 'ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) বলেছেন, প্রত্যেক রাকআতের প্রথমে তা একবার পড়লে পরবর্তী জন্মে তাই যথেষ্ট হবে।'^২

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) বলেছেন, 'ফরয নামাযে তা উচ্চস্বরে কিংবা গোপনে পড়বেই না। নফল নামাযে ইচ্ছা হয় পড়বে, না হয় পড়বে না। সকল নামাযেই তা পড়তে হবে। একথার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ: « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ [الفاتحة]. »

[২৬] হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) ও [২৭] হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) নামায এভাবে পড়তেন,^৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

^১ [২৩] (ক) আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ২, পৃ. ৯২, হাদীস: ২৬২৮:

عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حَرْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا تُصَلِّيَنَّ صَلَاةً حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ».

[২৪] (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৬৩২৬: «إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ يُعَذِّبُ تِلْكَ الرُّكْعَةَ».

^২ আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস: ২৬০৬:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِئُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ، وَالتَّعَوُّدُ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ.

^৩ [২৬] (ক) ইবনে খুযায়মা, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৪৯৩; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসাদদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ৮৪৮; (গ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬৬, হাদীস: ২৩৮৫, সহীহ ইবনে খুযায়মার ভাষ্য:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»... وَ﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [الفاتحة].

وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَكَانُوا يُسِرُّونَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

[২৮] ‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলে করীম (সা.)-এর মুকতাদী হয়ে নামায পড়েছি, হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত ওসমান (রাযি.)-এর পেছনেও পড়েছি। তাঁরা সকলেই بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ অস্পষ্ট স্বরে পড়তেন।’^১

কোনো কোনো নামাযে তা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রাখতেন এবং কোনো কোনো নামাযে তাঁরা তা উচ্চস্বরে পড়তেন না। আর এ তো জানাই আছে যে, তা ফরয নামাযের ব্যাপার। কেননা ফরয নামাযেই তাঁরা ইমামতি করতেন ও তাঁরা মুকতাদী হতেন। নফল নামাযে নয়। কেননা নফল নামায জামাআতে পড়া সুন্নাত নয়।

عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة].

[২৯] ‘হযরত আয়িশা (রাযি.), [৩০] হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফ্ফাল (রাযি.) ও [৩১] হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (সা.) থেকে ক্বিরাআত পাঠ শুরু করতেন।’^২

[২৭] (ঘ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ৯০৫; (ঙ) ইবনে খুযায়মা, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৫১, হাদীস: ৪৯৯; (চ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ১০০, হাদীস: ১৭৯৭, *সুনাযুন নাসায়ীর* ভাষ্য:

عَنْ نَعِيمِ الْمُجَرِّمِ . قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ثُمَّ قَرَأَ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ.

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ৫০ (৩৯৯):

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَلَمَّ أَسْمَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

^২ [২৯] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪০, পৃ. ৩২, হাদীস: ২৪০৩০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ২৪০ (৪৯৮):

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة].

[৩০] (গ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৭, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ১৬৭৮৭; (ঘ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনা*, খ. ১, পৃ. ২৬৭, হাদীস: ৮১৫; (ঙ) আত-তিরমিযী, *আস-সুনা*, খ. ২, পৃ. ১৩, হাদীস: ২৪৪; *সুনাযুন তিরমিযীর* ভাষ্য:

তাতে বোঝা যায় যে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উচ্চস্বরে পড়তেন না। তা আদর্শেই পড়তেন না, তা বোঝা যায় না।

কেউ যদি বলেন,

رَوَى أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة] وَلَمْ يَسْكُتْ.

[৩২] ‘হযরত আবু যুর’আ ইবনে আমর ইবনে জরীর’ (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) যখন দ্বিতীয় রাকআতে উঠে দাঁড়াতেন তখন الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দিয়েই শুরু করতেন, চুপ থাকতেন না।^২

তাকে বলা হয়েছে, এতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষের কোনো প্রমাণ নেই, যারা বোঝা যাবে যে, দ্বিতীয় রাকআতে তা পড়তেন না প্রমাণিত হয়েছে। যারা শুধু প্রথম রাকআতে পড়া যথেষ্ট মনে করেন তাদের পক্ষে এতে দলীল রয়েছে। তবে তা আদৌ পড়তেন না—এর পক্ষেও তা কোনো দলীল নয়।

وَقَدْ رَوَى قِرَاءَتُهَا فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَبْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.

‘নামাযের শুরুতে তা (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) পড়তেন একথা [৩৩] হযরত আলী (রাযি.), [৩৪] হযরত ওমর (রাযি.), [৩৫] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও [৩৬] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তা সাহাবীদের মতের বিপরীত নয়।’^৩

عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة].

[৩১] (ঙ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২০, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১২৭১৪ ও পৃ. ১৪৪, হাদীস: ১২৮৮৭; (চ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৪৯, হাদীস: ৭৪৩; (ছ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ৫০ (৩৯৯), *মুসনদে আহমদ*-এর ভাষ্য হচ্ছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة].

^১ আবু যুর’আ: আবু যুর’আ ইবনে আমর ইবনে জরীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী আল-কুফী (রহ.)

^২ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪১৯, হাদীস: ১৪৮ (৫৯৯)

^৩ [৩৩] (ক) আয-যায়লায়ী, *নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ৩৫৭; [৩৪] (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৬২, হাদীস: ৪১৫৭; [৩৫] (গ)

এতে ফরয ও নফল উভয় নামাযে তা পড়া প্রমাণিত হল। কেননা রাসূল ও সাহাবীগণ থেকে তা বর্ণিত হয়েছে তাদের বৈপরীত্য ছাড়াই। আর ফরয ও নফলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, না তা প্রমাণকরণে, না নিষেধকরণে। যেমন সমস্ত সুন্নাত নামাযে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রথম রাকআতে তা পড়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন, সব রাকআতে ও সব সূরায় তা পড়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। তা থেকে একথা বোঝা যায় না যে, তাঁর মতে তা সূরাসমূহের শুরু কথার নয় যদিও তা দু'সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী নিজ স্থানে একটি আয়াত। বরকতের জন্য তা দিয়ে শুরু করার জন্যে আমরা আদিষ্ট। পরে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তা নামাযের শুরুতে পঠনীয়—পূর্বে যেমন বলেছি। সব নামাযের মর্যাদা তো এক ও অভিন্ন। নামাযের সব কাজ তাহরীমার ওপর ভিত্তিশীল। ফলে সমস্ত নামায একটি কাজের ন্যায় অখণ্ড। তাই তার শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়াই যথেষ্ট। তা বারবার পড়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, তা যতই দীর্ঘ হোক না কেন। যেমন—কিতাবের একেবারে শুরুতে তা লেখা হয় একবার মাত্র। রুকু, সিজদা, তাশাহহুদ ও নামাযের অন্যান্য সমস্ত রুকনে তা নতুন করে পড়া হয় না, সূরা, রাকআতের শুরুতে তা যেমন পড়া হয়। তা তো দু'সূরার মাঝে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যেই পড়া হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا

يَعْرِفُ فَضْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

[৩৭] ‘মুহাম্মদ ইবনে বকর (রহ.) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহ.) থেকে, তিনি আমর^১ (রহ.) থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবায়র^২ (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে। তিনি বলেন, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ নাযিল হওয়ার পূর্বে দু'সূরার মাঝে পার্থক্যের কথা জানতেন না।^৩

আবদুর রাযযাক আস-সান'আনী, আল-মুসান্নাফ, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস: ২৬১০; [৩৬] (ঘ) আবদুর রাযযাক আস-সান'আনী, আল-মুসান্নাফ, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস: ২৬০৮

^১ আমর: আবু মুহাম্মদ, আমর ইবনে দীনার আল-মক্কী আল-জুমাহী আল-আসরাম (রহ.)

^২ সাঈদ ইবনে জুবায়র: সাঈদ ইবনে জুবায়র আল-আসাদী আল-কুফী (রহ.) দ

^৩ আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ৭৮৮

এ থেকে জানা গেল যে, দু'সূরার মাঝে পার্থক্য করাই بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-এর আসল কাজ। তা সূরার অংশ নয়। তাই প্রত্যেক সূরা শুরু করার সময় তা বারবার পড়ার প্রয়োজন নেই।

কেউ যদি বলেন, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-এর কাজ যখন দু'সূরার মাঝে পার্থক্য করা, তখন তা পড়ে দু'সূরার মাঝে পার্থক্য করাই তো বাঞ্ছনীয়। তাহলে তাকে বলা হবে, তা ওয়াজিব নয়। কেননা তা নাযিল হওয়ার দ্বারাই তো এই পার্থক্য বোঝা গেল। এখন বরকতের জন্যে তা শুরুতে পড়ার দরকার মাত্র। আর নামাযের শুরুতে তা পড়া হয়েছে। দ্বিতীয় রাকআতকালে নামায তো নতুন করে শুরু করা হচ্ছে না যে জন্যে তা আবার পড়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এজন্যে শুরুতে একবার পড়াই যথেষ্ট হবে। তা প্রত্যেক রাকআতে পড়ার একটি কারণই হতে পারে। তা হচ্ছে, বলা হয়েছে, প্রত্যেক রাকআতেই কিরাআত রয়েছে, যা তাতে শুরু করা হয় তা তার পূর্বের রাকআতের কিরাআতের স্থলাভিষিক্ত নয়। এ কারণে তা নতুন করে পড়া দরকার যেমন প্রথম রাকআতে তা পড়া হয়েছে। প্রথম রাকআতের তা পড়া মসনুন যেমন দ্বিতীয় রাকআতেও তেমনি করতে হবে। কেননা তখনও তো নতুন করে কিরাআত শুরু করতে হয়। তবে প্রত্যেক সূরা পড়ায় তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। কেননা তা একই ফরয নামায। আর সূরার ব্যাপার এক রাকআত তার পূর্ববর্তী রাকআতের মতোই। কেননা তা এমন কাজের ধারাবাহিকতা যা আগেই শুরু করা হয়েছে, ধারাবাহিক কাজের অবস্থা শুরুর মতোই। যেমন- রুকু যদি তা দীর্ঘ করা হয় সিজদাও তেমনি। সমস্ত নামাযই একই কাজের ধারাবাহিকতা মাত্র। কাজেই তার দাবি শুরুর দাবি। শুরু করা যেমন ফরয, পরবর্তী কাজও তাই হবে।

প্রত্যেক সূরায় তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন যারা মনে করেন তারা দু'ভাগে রয়েছেন। এক ভাগের মনীষীরা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কে সূরার অংশ মনে করেন না। অন্য ভাগের লোকেরা তাকে সূরাসমূহের প্রথমে উল্লিখিত মনে করেন, তাঁরা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কে পুনরাবৃত্তি করা জরুরি মনে করেন যেমন সূরার সমস্ত আয়াত পড়া হয়। যারা তাকে সূরার অংশ মনে করেন তারা প্রত্যেকটি সূরাকে নতুনভাবে শুরু করা নামাযবৎ মনে করেন। অতএব তা পড়েই শুরু করতে হবে যেমন নামাযের শুরুতে করা হয়েছে। কেননা সহীফায় তেমনই তো রয়েছে। যেমন নামাযের বাইরে সূরা পড়া শুরু করা হয়েছে। কেননা সহীফায় তেমনই তো রয়েছে। যেমন নামাযের বাইরে সূরা

পড়া শুরু করা হয় بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে, তেমন অপর কোনো সূরা পড়ার সময় করতে হয়।

وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُنزِلْتُ عَلَى سُورَةِ أَنْفَا»، ثُمَّ قَرَأَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ১] إِلَى آخِرِهَا حَتَّى خَتَمَهَا.

[৩৮] ‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘আমার ওপর কিছু সময় পূর্বে একটি সূরা নাযিল হয়েছে’ এ বলে পড়তে শুরু করে পড়লেন بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। তার পরই পড়লেন, ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾। পড়ে সূরাটি শেষ করলেন।’^১

وَرَوَى أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ﴿الرَّسْمُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ [الحجر: ১].

[৩৯] ‘হযরত আবু বুরদা^২ (রহ.) তাঁর পিতা^৩ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) পড়লেন, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الرَّسْمُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ।’^৪

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা.) নামাযের বাইরে এ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়েই কুরআন পাঠ শুরু করতেন। নামাযেও এই নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ أُمَّ الْقُرْآنِ بِ- «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَيَفْتَتِحُ السُّورَةَ بِ- «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

^১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৯, পৃ. ৪৫, হাদীস: ১১৯৯৬; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩০০, হাদীস: ৫৩ (৪০০); (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৭৮৪; (ঘ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ৯০৪

^২ আবু বুরদা: কাযী, আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা আল-আশআরী আল-কুফী (রহ.)

^৩ তাঁর পিতা: আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.)

^৪ (ক) ইবনে আবু আসিম, *আস-সুন্নাহ*, খ. ২, পৃ. ৪০৫, হাদীস: ৮৪৪; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ২, পৃ. ২৬৫, হাদীস: ২৯৫৪; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৭৮৪; (ঘ) আল-বায়হাকী, *আল-বাসু ওয়ান মুশরু*, পৃ. ৯১, হাদীস: ৭৯

[৪০] ‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার’ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সূরা আল-ফাতিহা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়েই পড়া শুরু করতেন এবং অন্যান্য সূরাও সেভাবেই পড়তেন।^২

وَرَوَى جَرِيرٌ، عَنْ أَلِ مُغِيرَةَ، قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ، فَقَرَأَ فِي صَلَاةِ أَلِ-مَغْرِبٍ: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ﴾ [الفيل: ১] حَتَّى إِذَا خَتَمَهَا وَصَلَ بِخَاتَمَتَيْهَا ﴿إِلَيْفِ قُرَيْشٍ ۚ﴾ [قریش: ১] وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

[৪১] ‘জরীর’ (রহ.) মুগীরা^৪ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) নামাযে আমাদের ইমামত করলেন। মাগরিবে তিনি সূরা আল-ফীল (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ) পড়লেন। সে সূরাটি শেষ করে তার সাথে মিলিয়ে সূরা কুরাইশ (إِلَيْفِ قُرَيْشٍ ۚ) সূরা পড়লেন। দুটি সূরার মাঝে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে পার্থক্য রচনা করলেন না।^৫

উচ্চৈঃশ্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ

বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃশ্বরে পড়ার ব্যাপারে হানাফী ফিকহবিদগণ এবং ইমাম সুফয়ান আস-সওরী (রহ.) বলেছেন, তা অনুচ্চশ্বরে পড়বে। ইমাম ইবনে আবু লাইলা (রহ.) বলেছেন, ইচ্ছা হয় উচ্চৈঃশ্বরে পড়বে, ইচ্ছা হয় অনুচ্চশ্বরে। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন, উচ্চৈঃশ্বরে পড়বে। এ মতপার্থক্য ইমামের পশ্চাতে জামাআতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে। জামাআতে উচ্চৈঃশ্বরে

^১ আবদুল্লাহ ইবনে দীনার: আবু আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার আল-আদওরী (রহ.)

^২ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ৩৬২, হাদীস: ৪১৫৫:

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْتَحَى الصَّلَاةَ قَرَأَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فَإِذَا قَرَعَ مِنَ أَلِ-مَغْرِبِ قَرَأَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

^৩ জরীর: কাযী, জরীর ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে কুরত আয-যাব্বী আল-কুফী (রহ.)

^৪ মুগীরা: আবু হাশিম, মুগীরা ইবনে মিকসাম আয-যাব্বী (রহ.)

^৫ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ৩৬০৩:

عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مَحَلٍّ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَغْرِبِ لِإِلْفِ قُرَيْشٍ.

কুরআন পড়ার নামাযে এরূপ করবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে:

فَرَوَى عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَهَرَ بِـ «بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

[৪২] ‘ওমর ইবনে যার’ (রহ.) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন।^৩

وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُخْفِيهَا، ثُمَّ يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،
وَرَوَى عَنْهُ أَنَسٌ مِثْلَ ذَلِكَ.

[৪৩] ‘ইমাম হাম্মাদ (রহ.) ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রাযি.) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ উচ্চৈঃস্বরে চুপে চুপে পড়তেন। পরে সূরা আল-ফাতিহা উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন।^৪

[৪৪] ‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) তাঁর থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।^৫

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ يُسْرُونَ قِرَاءَةَ «بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» لَا يَجْهَرُونَ بِهَا.

^৩ ওমর ইবনে যার: আবু যার, ওমর ইবনে যার ইবনে আবদুল্লাহ আল-হামদানী আল-কুফী (রহ.)

^২ তাঁর পিতা: যার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুরার আল-হামদানী আল-কুফী (রহ.)

^৩ (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৬২, হাদীস: ৪১৫৭; (খ) আত-তাহাওয়া, *শরহ মা আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ১১৮৭; (গ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৭০, হাদীস: ২৪০০:

عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، جَهَرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

^৪ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ৪১৪৮:

عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، سَبْعِينَ صَلَاةً، فَلَمْ يَجْهَرْ فِيهَا بِـ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

^৫ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ৫০ (৩৯৯):

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبْنِ بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

[৪৫] ‘ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও তাঁর সঙ্গীগণ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ গোপনে পড়তেন, উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন না।^১

وَرَوَى أَنَسٌ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا يُسْرَانِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ،
وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ .

[৪৬] ‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর (রাযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ গোপনে পড়তেন।^২

[৪৭] ‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযি.)ও তাঁর নিকট থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন।^৩

وَرَوَى الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَهَرُ الْإِمَامِ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
فِي الصَّلَاةِ بِدْعَةٌ .

[৪৮] ‘মুগীরা (রহ.) ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইমাম بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উচ্চৈঃস্বরে পড়ে নামায শুরু করলে তা হবে বিদআত।^৪

وَرَوَى جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعِكْرِمَةَ أَلِ - جَهْرُ بِ «بِسْمِ اللَّهِ

^১ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, *কিতাবুল আসার*, খ. ১, পৃ. ১৬১, আসার: ৮২:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» : «إِنَّمَا أَغْرَابُهُ ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا هُوَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .

^২ আত-তাহাওয়ারী, *শরহ মা’ আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২০২, হাদীস: ১১৯৯:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ ، أَنَّهُ قَالَ : قُتِبَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغُثَّانُ بْنُ عُفَّانٍ ؓ ، فَكُلُّهُمْ كَانَ لَا يَقْرَأُ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ .

^৩ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৭, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ১৬৭৮৭; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৬৭, হাদীস: ৮১৫; (গ) আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৩, হাদীস: ২৪৪; *সুনানুত তিরমিযীর* ভাষা:

عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرُ ، وَمَعَ غُثَّانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا ، فَلَا تَقُلُهَا ، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفتح].

^৪ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৬০, হাদীস: ৪১৩৮:

عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَهَرُ الْإِمَامِ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» بِدْعَةٌ .

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَنَا إِذَا أَعْرَابِيٌّ.

[৪৯] ‘জরীর (রহ.) আসিম আল-আহওয়াল’ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নামাযে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উচ্চেষ্ট্রে পড়া সম্পর্কে ইকরামা^২ (রহ.)-এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, আমি এখানে একজন আ’রাবী মাত্র।^৩

وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَلْجَهْرُ فِي الصَّلَاةِ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

[৫০] ‘ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর একথাটি আমার নিকট পৌঁছেছে যে, নামাযে উচ্চেষ্ট্রে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়া আরবীয় ধরন।^৪

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ أَلْجَهْرِ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْأَعْرَابُ.

[৫১] হাম্মাদ ইবনে যায়দ^৫ (রহ.) কসীর^৬ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হাসান^৭ (রহ.)-কে নামাযে উচ্চেষ্ট্রে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়া বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এক কাজ আ’রাবীরা করে থাকে।^৮

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়:

^১ আসিম আল-আহওয়াল: আবু আবদুর রহমান, আসিম ইবনে সুলাইমান আল-আহওয়াল (রহ.)

^২ ইকরামা: মওলায়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) আবু আবদুল্লাহ, ইকরামা (রহ.)

^৩ আয-যায়লায়ী, নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ৩৪৭:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَلْجَهْرُ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ.

^৪ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, কিতাবুল আসার, খ. ১, পৃ. ১৬১, আসার: ৮২:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»: إِنَّمَا أَعْرَابِيَّةٌ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.

^৫ হাম্মাদ ইবনে যায়দ: হাম্মাদ ইবনে যায়দ ইবনে দিরহাম আল-আযদী (রহ.)

^৬ কসীর: আবু কুররা, কসীর ইবনে শিনযীর আল-মায়নী আল-বাসরী (রহ.)

^৭ হাসান: হাসান ইবনে আবুল হাসান আল-বাসরী (রহ.)

^৮ আয-যায়লায়ী, নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া, খ. ১, পৃ. ৩৫৮

فَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَهَرَ بِهَا.
[৫২] ‘আসিম’ (রহ.) সাদ্দ ইবনে জুবায়র (রহ.) শরীক^২ (রহ.)
বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) بِسْمِ اللَّهِ
উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন।^৩

এটা হয়তো নামাযের বাইরের ব্যাপার হবে।

وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَهْرِ بِـ
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قَالَ: ذَلِكَ فِعْلُ الْأَعْرَابِ.

[৫৩] ‘আবদুল মালিক ইবনে আবু হুসায়ন^৪ (রহ.) ইকরামা (রহ.)
থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূত্রে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
উচ্চৈঃস্বরে পড়া পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এটা আরবদের
কাজ।^৫

[৫৪] ‘হযরত আলী (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এটিকে
একটি আয়াত গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ধরে সূরা আল-
ফাতিহা ৭ আয়াতে সম্পূর্ণ।^৬

[৫৫] তবে নামাযে তিনি তা উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন এমন কথা প্রমাণিত
নয়।^৭

^১ আসিম: আবু আবদুর রহমান, আসিম ইবনে সুলাইমান আল-আহওয়াল আল-বাসরী (রহ.)

^২ শরীক: আবু আবদুল্লাহ, শরীক ইবনে আবদুল্লাহ আন-নখরী আল-কুফী (রহ.)

^৩ আত-তাহাওয়ারী, *শরহ মা’ আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ১১৮৮

^৪ আবদুল মালিক: আবদুল মালিক ইবনে আবু বশীর আল-বাসরী (রহ.)

^৫ (ক) আত-তাহাওয়ারী, *শরহ মা’ আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২০৪, হাদীস: ১২০৯; (খ) আবদুর রাযযাক আস-সান‘আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ২, পৃ. ৮৯, হাদীস: ২৬০৫; (গ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ৪১৪৩, তাহাওয়ারী ভাষ্য:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ: فِي الْجَهْرِ بِـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قَالَ: «ذَلِكَ فِعْلُ الْأَعْرَابِ».

^৬ (ক) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৭, হাদীস: ১১৯৪; (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ২৩৮৮:

عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ؓ، عَنِ السَّيِّعِ الْمَثْنَيْنِ، فَقَالَ: ﴿أَتَعْبُدُ لِلَّهِ﴾ [الفتحة]، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا هِيَ سِتُّ آيَاتٍ، فَقَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيَةٌ.

^৭ (ক) আবদুর রাযযাক আস-সান‘আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ২, পৃ. ৮৮, হাদীস: ২৬০১; (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ৪১৪৬:

وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ لَا يَجْهَرَانِ بِـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِأَمِينٍ.

[৫৬] ‘আবু বকর ইবনে আইয়াশ’ (রহ.) আবু সাইদ^২ (রহ.) থেকে আবু ওয়ায়িল^৩ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ও اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ উচ্চেষ্ট্রে পড়তেন না। আমীনও জোরে বলতেন না।^৪

[৫৭] ‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নামাযে তা উচ্চেষ্ট্রে পড়তেন বলে বর্ণিত হয়েছে।’^৫

যেমন— পূর্বে বলেছি, আসলে এ বিষয় সাহাবীগণের মতপার্থক্য রয়েছে:

وَرَوَى أَنَسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَانُوا يُسِرُّونَ، وَفِي بَعْضِهَا: كَانُوا يُخْفُونَ.

[৫৮] ‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ও [৫৯] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.), হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত ওসমান (রাযি.) গোপনে পড়তেন, কোনো কোনো নামাযে অনুচ্চেষ্ট্রে পড়তেন।’^৬

عَنْ ثَوْبَرِ بْنِ أَبِي فَاتِحَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَجْهَرُ بِـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

^১ আবু বকর ইবনে আইয়াশ: আবু বকর ইবনে আইয়াশ ইবনে সালিম আল-আসাদী (রহ.)

^২ আবু সাঈদ: আবু সাঈদ, সাঈদ ইবনুল মারযুবান আল-বাক্কাল আল-কুফী (রহ.)

^৩ আবু ওয়ায়িল: শকীক ইবনে সালামা আল-কুফী (রহ.)

^৪ আত-তাহাওয়া, শরহ মা’ আনিয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ২০৩, হাদীস: ১১০৮

^৫ (ক) আবদুর রাযযাক আস-সান’আনী, আল-মুসান্নাফ, খ. ২, পৃ. ৯০, হাদীস: ২৬০৮; (খ) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ৩৬২, হাদীস: ৪১৫৫; (গ) আত-তাহাওয়া, শরহ মা’ আনিয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ১১৮৯, তাহাওয়ায়র ভাষ্য:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْعُ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قَبْلَ السُّورَةِ وَيَتَعَدَّهَا، إِذَا قَرَأَ سُورَةَ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ.

^৬ [৫৮] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ২৭, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ১৬৭৮৭; (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৬৭, হাদীস: ৮১৫; (গ) আত-তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১৩, হাদীস: ২৪৪; সুনানুত তিরমিযীর ভাষ্য:

عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقْلَهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: ﴿ اٰحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ﴾ [الفاغاة].

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযি.) এরূপ কাজকে বিদআত বলেছেন।

وَرَوَى أَبُو الْجَوَزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [الفاحة]. وَيُخَيِّمُهَا بِالتَّسْلِيمِ.

[৬০] ‘আবুল জাওয়া’ (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর একথাটি বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (সা.) তাকবীর ও اَلْحَمْدُ لِلَّهِ পড়ে নামায শুরু করতেন এবং সালাম ফেরানো দ্বারা তা শেষ করতেন।^২

حَدَّثَنَا أَبُو أُلْ - حَسَنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أُلْ - حُسَيْنُ الْكَرْخِيُّ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَا جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ بِ«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ.

‘আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন আল-কারখী (রাযি.) বলেছেন, আল-হাযরামী^৩ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মদ ইবনুল আলা^৪ (রহ.) থেকে, তিনি মুআবিয়া ইবনে হিশাম^৫ (রহ.) থেকে, মুহাম্মদ ইবনে জাবির^৬ (রহ.) থেকে, তিনি হাম্মাদ (রহ.) থেকে, তিনি ইবরাহীম আন-নখযী (রহ.) থেকে, হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (সা.) ফরয নামাযে

[৫৯] (ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২০, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১২৭১৪ ও পৃ. ১৪৪, হাদীস: ১২৮৮৭; (ঙ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৪৯, হাদীস: ৭৪৩; (চ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ৫০ (৩৯৯), *মুসনদে আহমদ*-এর ভাষ্য হচ্ছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [الفاحة].

^১ আবুল জাওয়া: আওস ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাবায়ী আল-বাসারী (রহ.)

^২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪০, পৃ. ৩২, হাদীস: ২৪০৩০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ২৪০ (৪৯৮):

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [الفاحة].

^৩ আল-খায়রামী: মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমান আল-খায়রামী আল-কুফী (রহ.)

^৪ মুহাম্মদ ইবনুল আলা: মুহাম্মদ ইবনুল আলা ইবনে কুরাইব আল-হামদানী আল-কুফী (রহ.)

^৫ মুআবিয়া ইবনে হিশাম: আবুল হাসান, মুআবিয়া ইবনে হিশাম আল-কাসসার আল-কুফী (রহ.)

^৬ মুহাম্মদ ইবনে জাবির: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সাইয়ার ইবনে তারিক আল-হানাফী (রহ.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উচ্চৈঃস্বরে পড়েননি। হযরত আবু বকর (রাযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.)ও নয়।^১

কেউ যদি বলেন, তোমর মতে তো তা নিজ স্থানে একটি আয়াত বিশেষ, তা হলে তা উচ্চৈঃস্বরে পড়াই ওয়াজিব হবে নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার মতো। বিশেষ করে যে নামাযে কুরআন উচ্চৈঃস্বরে পড়া হয়। কোনো কোনো নামাযের কোনো রাকআত তো উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত না পড়াই মৌলনীতি। আবার কোনো কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়াই নিয়ম।

জবাবে বলা হবে, তা সূরা আল-ফাতিহার অংশ নয়, শুধু তা পড়ে শুরু করতে হয় বরকতের জন্যে, তখন তা উচ্চৈঃস্বরে না পড়াই শ্রেয়। লক্ষণীয়, اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیَّ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۝ কুরআনের আয়াত হওয়া সত্ত্বেও এবং তা পড়ে নামায শুরু করতে হয়, তা সত্ত্বেও তা সবসময়ই অনুচ্চস্বরে পড়তে হয়, উচ্চৈঃস্বরে নয়। এখানেও সে রূপ করা সমীচীন।

ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন, রাসূল করীম (সা.) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ না শুনিye পড়তেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, তা সূরা আল-ফাতিহার অংশ নয়। যদি অংশ হতো তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তা উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন অন্যান্য আয়াতের মতোই।

رَوَى نَعِيمُ آلِ مُجْمِرٍ ، أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَرَأَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ثُمَّ لَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنِّي لَا شَبِيْهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [৬১] ‘নুআইম আল-মুজ্‌মির^২ (রহ.) বলেছেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর পেছনে নামায পড়েছি, তিনি নামাযে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে বললেন, আমি ঠিক রাসূল (সা.)-এর মতোই নামায পড়লাম।^৩

رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ثَلَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهَا ، فَيَقْرَأُ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۝

^১ আয-যায়লায়ী, নসবুর রাযা লি আহাদীসিল হিদাযা, খ. ১, পৃ. ৩৩৫

^২ নুআইম আল-মুজ্‌মির: নুআইম আল-মুজ্‌মির ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাদানী (রহ.)

^৩ (ক) আন-নাসায়ী, আল-মুজ্‌তাবা মিনাস সুনা, খ. ৩, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ৯০৫; (খ) ইবনে খুযায়মা, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৫১, হাদীস: ৪৯৯; (গ) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ১০০, হাদীস: ১৭৯৭, সুনাুন নাসায়ীর ভাষ্য:

عَنْ نَعِيمِ الْمُجْمِرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَرَأَ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

[৬২] ‘ইবনে জুরাইজ (রহ.) আবু মুলাইকা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উম্মে সালাম (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সা.) নিজের ঘরে নামায পড়েছিলেন, তাতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ও اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়তেন।^১

رَوَى جَابِرُ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

‘জারির আল-জু‘ফী^২ হযরত আবুত তুফাইল^৩ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, [৬৩] হযরত আলী (রাযি.) ও [৬৪] হযরত আম্মার^৪ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ জোরে পড়তেন।^৫

উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহের জবাবে বলা হবে, নুআইম আল-মুজ্জিমির (রহ) কর্তৃক হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উচ্চৈঃস্বরে পড়ার কোনো প্রমাণ নেই। তাতে বলা হয়েছে, তিনি পড়েছেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন তা তো বলা হয়নি। হতে পারে তিনি উচ্চৈঃস্বরে পড়েননি। পড়েছেন, তা তো বর্ণনাকারীর জানা-ই আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সে বিষয় খবরের মাধ্যমে অথবা তিনি ইমামের খুব নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই তা শুনতে পেয়েছিলেন। উচ্চৈঃস্বরে না পড়লে তা শোনা অসম্ভব নয়, এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে,

رُوي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا.

^১ (ক) ইবনে খুযায়মা, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৪৯৩; (খ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ৮৪৮; (গ) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ৬৬, হাদীস: ২৩৮৫, সহীহ ইবনে খুযায়মার ভাষ্য:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»... وَ﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة].

^২ জারির আল-জু‘ফী: আবু আবদুল্লাহ, জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল হারিস আল-জু‘ফী আল-কুফী (রাফিযী শিয়া)

^৩ আবুত তুফাইল: আবুত তুফাইল, আমির ইবনে ওয়াসিলা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)

^৪ আম্মার: আবুল ইয়াকযান, আম্মার ইবনে ইয়াসির ইবনে আমির ইবনে মালিক (রাযি.)

^৫ (ক) আদ-দারাকুতনী, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৬৭-৮২, হাদীস: ১১৫৮-১১৫৯ ও ১১৬৮; (খ) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ৪৩৯, হাদীস: ১১১:

عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوباتِ بِـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

[৬৫] ‘নবী করীম (সা.) যুহর ও আসরের নামাযে যে কীরাত পড়তেন তা অনেক সময় আমরা শুনতে পেতাম।’^১

কিন্তু তা যে তিনি উচ্চৈঃশ্বরে পড়েননি, সে বিষয়ে কোনো মতভেদই নেই।

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة] وَلَمْ يَسْكُتْ.

[৬৬] ‘আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জিয়াদ^২ (রহ.) উমারা ইবনুল কা’কা’^৩ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু যুরআ ইবনে আমর ইবনে জরীর (রহ.) থেকে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল করীম (সা.) যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্যে উঠতেন তখন الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দিয়ে শুরু করতেন, থামতেন না।’^৪

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-কে সূরা আল-ফাতিহার অংশ মনে করেন না। আর তা হয়ে থাকলে তা উচ্চৈঃশ্বরে পড়ার প্রশ্ন উঠে না। যা তার অংশ নয়, তা জোরে না পড়াই তো স্বাভাবিক, তবে উম্মে সালামার হাদীস:

رَوَى اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ مُعَلَّى، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا.

[৬৭] ‘লাইস^৫ (রহ.) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে আবু মুলাইকা থেকে (রহ.) বর্ণিত, মু’আল্লা (রহ.) হযরত উম্মে

^১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৫২, হাদীস: ৭৬২; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ১৫৪-১৫৫ (৪৫১); (গ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৭১, হাদীস: ৮২৯: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةَ سُورَةٍ، وَيُسَمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا».

^২ ইবনে জিয়াদ: আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জিয়াদ আল-আবদী (রহ.)

^৩ উমারা ইবনুল কা’কা’: উমারা ইবনুল কা’কা’ ইবনে শুবরুমা আয-যাব্বী আল-কুফী (রহ.)

^৪ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৪১৯, হাদীস: ১৪৮ (৫৯৯)

^৫ লাইস: লাইস ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আল-ফাহমী (রহ.)

সালমা (রাযি.)-কে রাসূলে করীম (সা.)-এর কিরাআতের পাঠ সম্পর্কের জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে ও অক্ষরে অক্ষরে বলেন।^১

এ বর্ণনায় রাসূল (সা.)-এর কিরাআত পাঠের নিয়ম-পদ্ধতিই বলা হয়েছে, কিন্তু তা নামাযে পড়ার উল্লেখ নয়, তা জোরে বা গোপনে পড়ারও কথা নয়। আর তিনি তা বহুবারই পড়ে থাকবেন, তা আর বিচিত্র কী?

অনুরূপভাবে আমরাও বলব, কিন্তু তা উচ্চৈঃশ্বরে পড়া হবে না। হতে পারে নবী করীম (সা.) তাঁর কিরাআতের বিবরণ দিয়েছেন, হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) তা-ই শুনিয়েছেন। হতে পারে, তিনি তাঁকে পড়তে শুনেছেন অনুচ্চশ্বরে, তা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন নিকটে থাকার সুযোগে। এ থেকে এ-ও বোঝা যায়, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (সা.) তাঁর ঘরে এভাবে নামায পড়তেন, তা ফরয নামায ছিল না। কেননা তিনি ফরয নামায কখনই একাকী পড়তেন না। জামাআতের সাথে পড়তেন। আর আমাদের মতে এককভাবে নফল নামায গোপনে বা উচ্চৈঃশ্বরে যেভাবেই ইচ্ছা পড়তে পারে।

হযরত আবুত তুফাইল (রাযি.) থেকে জাবির আল-জু'ফী বর্ণিত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। ... তিনি বহু বর্ণনায় মিথ্যা বলেছেন। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ইমামগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন।

وَقَدْ رَوَى أَبُو وَائِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا.

[৬৮] ‘আবু ওয়ায়িল (রহ.) হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তা উচ্চৈঃশ্বরে পড়তেন না।’^২

যদি জোরে পড়া তার নিকট প্রমাণিত হতো তাহলে তিনি তাঁর বিরোধিতা কখনই করতেন না। জোরে বা অনুচ্চশ্বরে পড়া সংক্রান্ত বর্ণনা যদি সমান সমানও হতো নবী করীম (সা.) থেকে, তাহলেও অস্পষ্টভাবে পড়াই উত্তম। তার দুটি কারণ:

১. আগের লোকদের অস্পষ্টভাবে পড়ার কথা প্রকাশমান, জোরে পড়া নয়। হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফ্ফল (রাযি.),

^১ (ক) ইবনে খুযায়মা, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৪৯৩; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আল-আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ৮৪৮; (গ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬৬, হাদীস: ২৩৮৫

^২ আত-তাহাওয়া, *শরহ মা' আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২০৩, হাদীস: ১১০৮

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) সকলেই অস্পষ্ট স্বরে পড়তেন। তা জোরে পড়া পর্যায়ে ইবরাহীমের কথা বিদআত। কেননা নিয়ম হচ্ছে, একই বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর দুটি পরস্পর বিপরীত বর্ণনা হলে আগের কালের মহান ব্যক্তিদের আমল থেকে যা সমর্থিত হবে তা-ই অধিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

২. আর দ্বিতীয় কারণ জোরে পড়া যদি প্রমাণিত হয়, তা রদ করে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- অন্যান্য সব কিরাআত পর্যায়ে পাওয়া যায়, তাহলে মুতাওয়াতির বর্ণনা না পাওয়ার দরুনই বুঝতে হবে যে, তা প্রমাণিত নয়। কেননা তা জোড়ে পড়া মসনুন একথা জানার প্রয়োজন। সূরা আল-ফাতিহা জোড়ে পড়া মসনুন হওয়ার কথা তো সেভাবেই জানা গেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يقرأ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَمْ يُكَبِّرْ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، فَتَنَاهُ الْإِمَامُ جُرُؤَنَ حِينَ سَلَّمَ وَالْأَنْصَارُ: أَيُّ مُعَاوِيَةَ سَرَقَتِ الصَّلَاةَ، أَيْنَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ وَأَيْنَ التَّكْبِيرُ إِذَا خَفَضَتْ وَإِذَا رَفَعَتْ؟ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَالَ فِيهَا ذَلِكَ الَّذِي عَابُوا عَلَيْهِ.

[৬৯] ‘আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-আসম (রহ.) রবী ইবনে সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম শাফিযী (রহ.) বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে খায়সাম (রহ.) বলেন, ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রাফাআ (রহ.) তাঁর পিতা উবাইদ ইবনে রাফাআ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত, হযরত মুআবিয়া (রাযি.) মদীনায় এলেন ও তাঁদের নিয়ে নামায পড়লেন, কিন্তু بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়লেন না, যখন রুকুতে গেলেন ও রুকে থেকে উঠলেন, তখন তাকবীরও বললেন না, তখন নামায ফেরানোর পর মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ বলে উঠলেন, হে মুআবিয়া! তুমি তো নামায চুরি করেছ। কোথায় তোমার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রুকুতে যাওয়া উঠার সময় কোথায় তোমার তাকবীর? অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে পুনরায় নামায পড়াতে বাধ্য হন।^১

এখানে যে ক্রটি সাহাবীগণ ধরলেন, তা হচ্ছে জোরে না বলা। তাহলে বোঝা গেল, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ জোরে না পড়া নামাযে বিশেষ ক্রটি।

এর জবাব হচ্ছে, আসলেও যদি তা-ই হতো, তাহলে তা হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.), হযরত ওসমান (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফফল (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং অন্যান্যরা بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ চুপচাপ পড়েছেন, জোরে পড়েননি—তারা সকলেই তা জানতেন। কেননা রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন,

«لَيْلِيَّيْنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ»

[৭০] ‘বুদ্ধিমান-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরাই যেন আমার নিকটে থাকে।’^২

উপর্যুক্ত ব্যক্তিগণই তো রাসূল (সা.)-এর অতীব নিকটবর্তী লোক ছিলেন। নামাযেও তাঁরাই অন্যদের অপেক্ষা বেশি নিকটে অবস্থান নিতেন। তাঁদের বাদ দিয়ে অন্য যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তো অপরিচিত। আর বর্ণনাটিও পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ নয়। কেননা তা যে মুহাজির ও আনসারগণ বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা তো একক ব্যক্তি, একক সূত্রে বর্ণনা। তা ছাড়া তাতে উচ্চৈঃস্বরে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ার কথাও বলা হয়নি। তাতে বলা হয়েছে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়েননি। আমরাও তা না পড়ার কথা বলি না, তা জোরে পড়া হবে কি অনুচ্চস্বরে—এর মধ্যে কোনটা উত্তম, তাই নিয়েই তো আমাদের আলোচনা।

বিসমিল্লাহ পর্যায়ে শরীয়তের হুকুম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে সব কাজ শুরু করাই শরীয়তের হুকুম। তা বরকতের জন্যে, আল্লাহর বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, যবেহ করাকালে তা

^১ (ক) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৮৩-৮৪, হাদীস: ১১৮৮; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আল্লাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ৮৫১; (গ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৭২, হাদীস: ২৪১০-২৪১১

^২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৮, পৃ. ৩২৭, হাদীস: ১৭১০২; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ১২২-১২৩ (৪৩২); (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৮০, হাদীস: ৬৭৪, হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

বলা দীন-ইসলামের বিশেষত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন নিয়ম, তা বলে শয়তান তাড়ানো হয়।

رُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمَى اللَّهُ الْعَبْدُ عَلَى طَعَامِهِ لَمْ يَنْلُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ مَعَهُ، وَإِذَا لَمْ يُسَمِّهِ نَالَ مِنْهُ مَعَهُ».

[৭১] নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, খাওয়ার সময় বান্দা যদি আল্লাহ নাম উচ্চারণ করে তাহলে শয়তান তার সাথে খেতে বসতে পারে না। তাঁর নাম উচ্চারণ না করা হলে শয়তান অবশ্যই খাওয়ার শরীক হবে।^১

মুশরিকরা তাদের কাজ-কর্ম শুরু করে তাদের দেব-দেবী মূর্তির নামে, যাদের ওরা পূজা করে। ওদের বিরোধিতা করা হবে যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কাজ শুরু করা হয়, তা ভীতকে সাহসী বানায়, তা উচ্চারণ করলে বান্দা একান্তভাবে আল্লাহমুখী হয়ে যেতে পারে। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, শ্রোতা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা পায়, এতে আল্লাহকে স্বীকার করা হয়। তাঁর নিয়ামতের স্বীকৃতি হয়, তাঁর নিকট পানা চাওয়া হয়। এতে আল্লাহর দুটি বিশেষ নাম রয়েছে, রহমান ও রহীম। আল্লাহ ছাড়া এ নাম কারোর হতে পারে না।

^১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৮, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ২৩২৪৯ ও পৃ. ৩৯১, হাদীস: ২৩৩৭৩; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩২৩, হাদীস: ১২২-১২৩ (৪৩২); (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ৩৭৬৬, হযরত ছয়াইফাতুল ইয়ামান (রাযি.) থেকে বর্ণিত:

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ».

সূরা আল-ফাতিহার আহকাম

নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ

আমাদের ফিকহবিদগণ সকলেই একমত হয়ে বলেছেন, সূরা আল-ফাতিহা এবং তার সাথে আরেকটি সূরা বা আয়াত প্রথম দু'রাকআতেই পড়তে হবে। সূরা আল-ফাতিহা পড়া না হলে বা তার পরিবর্তে অন্য কিছু পড়া হলে খুবই খারাপ হবে। তবে তার নামায হয়ে যাবে। ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) বলেছেন, প্রথম দু'রাকআতে সূরা আল-ফাতিহা পড়া না হলে নামায আবার পড়তে হবে। ইমাম শাফি'রী (রহ.) বলেছেন যে, কম-সে-কম পরিমাণ পড়লে নামায হয়ে যায়, তা হল সূরা আল-ফাতিহা। তার একটি অক্ষরও বাদ দিলে, না পড়লে এবং নামায শেষ করে ফেললে সে নামায আবার পড়তে হবে।

ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন,
رَوَى الْأَعْمَشُ، عَنْ حَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ بْنِ رَبِيعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تُحْزِرُ صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.

[৭২] 'আল-আ'মাশ' (রহ.) খায়সামা^২ (রহ.) থেকে, তিনি আব্বাদ ইবনে রিবয়ী^৩ (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রাযি.) বলেছেন, যে নামাযে সূরা আল-ফাতিহা ও দু'আয়াত বা তারও বেশি পড়া হবে না সে নামায হবে না।^৪

^১ আল-আ'মাশ: আবু মুহাম্মদ, সলাইমান ইবনে মিহরান আল-আসাদী আল-কাহিলী আল-আ'মাশ (রহ.)

^২ খায়সামা: খায়সামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সাবরা আল-মায়হিজী আল-জু'ফী (রহ.)

^৩ আব্বাদ ইবনে রিবয়ী: আবায়্যা ইবনে রিবয়ী আল-আসাদী আল-কুফী (রহ.)

^৪ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৩৬২৪:

عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رَبِيعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تُحْزِرُ صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا».

وَرَوَى ابْنُ عُثَيْبٍ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،
قَالَ: لَا تُجْزِي صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.

[৭৩] ‘ইবনে উলাইয়া’ (রহ.) আল-জুরাইরী^২ (রহ.) থেকে, ইবনে বুরায়দা^৩ (রহ.) সূত্রে হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যে নামাযে সূরা আল-ফাতিহা ও দু’আয়াত বা তার বেশি পড়া হয়নি সে নামায হয়নি।^৪

وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ
الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، قَالَ: اقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ
قَلِيلٌ.

[৭৪] ‘মা’মার^৫ (রহ.) আইয়ুব^৬ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, আবুল আলিয়া^৭ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক রাকআতের কিরআত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, কম-বেশি যাই হোক পড়। কুরআনের কম বলতে কোনো জিনিস নেই।^৮

وَرَوَى عَنْ أَحْسَنَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَنْ نَسِيَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَقَرَأَ غَيْرَهَا لَمْ يَضُرَّ وَتُجْزِيهِ.

[৭৫] ‘হাসান আল-বাসরী (রহ.), [৭৬] ইবরাহীম আন-নাখরী (রহ.)
ও [৭৭] শা’বী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক সূরা আল-

^১ ইবনে উলাইয়া: আবু বিশর, ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মিকসাম আল-আসাদী (রহ.)

^২ আল-জুরাইরী: আবু মাসউদ, সাঈদ ইবনে ইয়াস আল-জারীরী আল-বাসরী (রহ.)

^৩ ইবনে বুরায়দা: আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা ইবনুল হুসাইব আল-আসাদী (রহ.)

^৪ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৩৬২২:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «لَا تُجْزِي صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا».

^৫ মা’মার: মা’মর ইবনে রাশিদ আল-আযাদী আল-বাসরী (রহ.)

^৬ আইয়ুব: আবু বকর, আইয়ুব ইবনে তামীমা আস-সিখতিয়ানী আল-আনাযী (রহ.)

^৭ আবুল আলিয়া: আবুল আলিয়া আল-বাবরা আল-বাসরী (রহ.)

^৮ (ক) আবদুর রাযযাক আস-সান’আনী, আল-মুসান্নাফ, খ. ২, পৃ. ৯৩, হাদীস: ২৬২৬; (খ) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ১, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৩৬৩০:

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «اقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ قَلِيلٌ».

ফাতিহা পড়া ভুলে গেছে, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু পড়েছে, তার নামায ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তা হয়ে যাবে।^১

وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ يَحْيَى، أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَامَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ فَقَرَأَ: ﴿مُذْهَمَاتَيْنِ ۖ﴾ [الرحمن: ৭৬]، ثُمَّ رَكَعَ.

[৭৮] ‘ওয়াকী’ (রহ.) জরীর ইবনে হাযিম^২ (রহ.) থেকে বর্ণা করেছেন, ওয়ালদি ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একদিন জাবির ইবনে যায়দ^৩ (রহ.) নামায পড়তে দাঁড়িয়ে মুড্‌হামতীন^৪ পড়ে রুকুতে গেলেন।^৪

ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.) বলেছেন, হযরত ওমর (রাযি.) ও ইমরান ইবনে হুসায়ন (রাযি.) থেকে সূরা আল-ফাতিহা ও আরও দু’আয়াত না পড়লে নামায হবে না বলে যা বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ নামাযের পূর্ণাঙ্গ না হওয়া। নামায একেবারেই হবে না সে অর্থ নয়। কেননা শুধু সূরা আল-ফাতিহা পড়লেও নামায হয়ে যাবে এ বিষয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্যই নেই। সূরা আল-ফাতিহা না পড়লেও নামায হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত দলীল:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ

^১ [৭৫] (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৪৮, হাদীস: ৪০০২:

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: «إِنْ كَانَ قَرَأَ غَيْرَهَا أَجَزَأَ عَنْهُ».

[৭৬] (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৪৮, হাদীস: ৪০০৩:

عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسِي فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَيَقْرَأُ سُورَةً، أَوْ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهَا شَيْئًا قَالَ: «يُجْزِيهِ».

[৭৭] (খ) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩৪৮, হাদীস: ৪০০৪:

عَنْ عَامِرٍ وَالحَكَمِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يَقْرُؤُهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

^২ জরীর ইবনে হাযিম: আবু নসর, জরীর ইবনে হাযিম ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আযদী আল-বাসরী (রহ.)

^৩ জাবির ইবনে যায়দ: আবুশ শা’সা, জাবির ইবনে যায়দ আল-আযদী আল-ইয়াহমাদী (রহ.)

^৪ ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩১৮, হাদীস: ৩৬৩১:

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَرَأَ ﴿مُذْهَمَاتَيْنِ ۖ﴾ [الرحمن: ৭৬]، ثُمَّ رَكَعَ.

‘সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত আচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের কুরআন স্থায়ী রীতি অবলম্বন কর।’^১

আয়াতটির পক্ষে অসুবিধাজনক হলেও তা যথার্থ। তার অর্থ ফজরের নামাযে কুরআন পড়া। কেননা ফজরের নামাযের সময় কিরাআত পাঠ ফরয না হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্যমত্য রয়েছে। তবে মূল নামাযে কুরআন পাঠ ফরয। এখানকার আদেশই ফরয প্রমাণ করে। মুস্তাহাব হওয়ার কোনো দলীল নেই। অতএব বাহ্যিকভাবে যতটুকুই কুরআন পড়া হোক তাতেই নামায আদায় হয়ে যাবে। কেননা তাতে কোনো কিছু থেকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

‘কুরআন থেকে সহজেই যা সম্ভব পড়।’^২

কুরআনের আয়াতের এই পড়ার আদেশ নামাযে কুরআন পড়া বোঝায়। এ আয়াতের পূর্ববর্তী কথাসমূহই তার প্রমাণ আয়াতটির শুরু হচ্ছে,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ

‘তোমার রব জানেন, তুমি রাতের দুই-তৃতীয়াংশ সময়, তার অর্ধেক এবং তার এক-তৃতীয়াংশ সময় তুমি নামাযে দাঁড়াও....।’^৩

মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এ আয়াতে রাত্রিকালীন নামাযের কথা বলা হয়েছে। আর ‘কুরআনের যতটুকু বা যা-ই পড়া সহজ তা-ই পড়’ এই আদেশ রাত্রিকালীন নফল নামায এবং অন্য সব ফরয নামাযের ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই প্রযোজ্য। এ আয়াতে যে ফরয-নফল সব নামাযই शामिल তার প্রমাণ একটি হাদীস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي تَعْلِيمِ النَّبِيِّ ﷺ الْأَعْرَابِ الصَّلَاةَ حِينَ لَمْ يُحْسِنُهَا، فَقَالَ لَهُ: «تُمْ أَقْرَأُ: ﴿مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾» [المزمل: ৭২] وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ.

[৭৯] ‘হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) ও [৮০] রিফায়া ইবনে রাফি’ (রাযি.) বর্ণিত, নবী করীম (সা.) একজন আ’রাবীকে নামায পড়ার

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৮

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযায্মিল, ৭৩:২০

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-মুযায্মিল, ৭৩:২০

নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা সে সুন্দরভাবে নামায পড়তে পারছিল না। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, ‘অতঃপর তোমার পক্ষে কুরআনের যা পড়া সম্ভব ও সহজ তা-ই পড়।’^১

রাসূল (সা.)-এর একথাটি কুরআনেরই ভিত্তিতে বলা। কেননা একথা সর্ববাদীসম্মত যে, নবী করীম (সা.)-এর কোনো আদেশ কুরআনে উল্লিখিত কোনো হুকুমের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাহলে বলতেই হবে, তিনি এই হুকুম কুরআন থেকেই দিয়েছেন। যেমন- তিনি চোরের হাত কাটা ও ব্যতিচারীকে দোররা মারা ইত্যাদির আদেশ কুরআনের ভিত্তিতেই দিয়েছেন। কুরআন পড়া সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আয়াতে ফরযকে বাদ দিয়ে শুধু নফল নামাযের জন্যেই আদেশ আসেনি। অতএব বুঝতেই হবে যে, উক্ত আদেশ সকল নামাযেই পালনীয়। আর এ আদেশের দৃষ্টিতে সূরা আল-ফাতিহা না পড়লেও নামায হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। দুটি দিক দিয়ে কথা বিবেচ্য: একটি হল, হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, আয়াতটি সব নামাযেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত সূরা আল-ফাতিহা ছাড়াও যে নামায হয়, তা স্বতন্ত্রভাবে তা থেকে প্রমাণিত হয়। কেননা নামায হিসেবে ফরয ও নফলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ‘কিরাআত’ পাঠও উভয়ের মধ্যেই জরুরি। আর যা নফল নামাযে জায়েয, ফরয নামাযেও তা জায়েয। দু’নামাযের রুকু-সিজদার মধ্যেও কোনোরূপ পার্থক্য নেই। সব নামাযের ‘রুকন’ এক ও ভিন্ন।

কেউ বলতে পারেন, তোমার মতে নফল ও ফরয নামাযের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা তোমার নিকট ফরয নামাযের শেষ দু’রাকআত কিরাআত ফরয নয়। অথচ নফল নামাযে তা ওয়াজিব।

এর জবাবে বলা যাবে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের তুলনায় নফল নামাযে কুরআন পাঠের হুকুম অধিক তাগিদপূর্ণ। সূরা আল-ফাতিহা না পড়লেও নফল নামায হয়ে যায় যখন, তখন ফরয নামায অবশ্যই হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এ দু’নামাযের মধ্যে কেউই পার্থক্য করেননি। এই

^১ [৭৯] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫২, হাদীস: ৭৫৭; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৮, হাদীস: ৪৫ (৩৯৮); (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩৩৬, হাদীস: ১০৬০; (ঘ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৬, হাদীস: ৮৫৬, *সহীহ আল-বুখারী*র ভাষ্য:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

[৮০] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩১, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪, হাদীস: ১৮৯৯৭; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৪৬০; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৬-২২৮, হাদীস: ৮৫৭-৮৬০; (ঘ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১০০-১০১, হাদীস: ৩০২

দুইয়ের কোনো একটি নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়া ফরয মনে করলে অপর নামাযেও তা ফরয মনে করতে হবে। আর একটিতে তা অ-ফরয ধরলে অপরটিতেও তাই ধরতে হবে। একথা যখন প্রমাণিত হল যে, আমাদের মতে আয়াতের বাহ্যিক দিক দিয়ে সূরা আল-ফাতিহা ছাড়াও নফল নামায জায়েয, তখন ফরয নামাযেও তাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সূরা আল-ফাতিহা ছাড়াও নামায হয় একথা আয়াত থেকে কি করে প্রমাণিত হল?

জবাবে বলতে হবে, **قُلْ مَا تَكْسِرُ مِنَ الْقُرْآنِ** (কুরআনের যা সহজ ও সম্ভব তাই পড়) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত ইখতিয়ার প্রমাণিত হয়। এ যেন বলা হয়েছে, **اقْرَأْ مَا شِئْتَ** (পড় যা-ই তুমি ইচ্ছা কর)।

কেউ যদি কাউকে বলে, আর এ দাসটিকে তুমি যেকোনো মূল্যে বিক্রয় করে দাও, তা হলে এই বোঝা যাবে যে, যেকোন মূল্যে দাসটি বিক্রয় করার ইখতিয়ার রয়েছে। অনুরূপভাবে আয়াতটি যখন নামাযীকে কুরআনের যেকোন অংশ পড়ার ইখতিয়ার দিচ্ছে তখন তা অগ্রাহ্য করা আমাদের জন্য জায়েয হতে পারে না। আমরা কোনো একটি অংশকে নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না। বলতে পারি না যে, সূরা আল-ফাতিহাই পড়তে হবে। তা বললে আয়াতে দেওয়া ইখতিয়ারকে মনসুখ করে দেওয়া হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের আয়াত: **فَمَا اسْتَسْرَمَ مِنْهُ هَذِي** (যেকোনো জন্তু কুরবানী করা সহজ হবে তাই কর')।

এতেও ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ইখতিয়ারকে উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। অথচ ব্যবহৃত শব্দ **فَمَا اسْتَسْرَمَ مِنْهُ** গরু, উট ও ছাগল ছাড়া অন্যান্য জন্তুও বোঝায়। এটা করার কারণে ইখতিয়ার মনসুখ করা হয়েছে বলে তো মনে করা হয় না?

জবাবে বলা যাবে, উক্ত তিন প্রকারের জন্তু যেকোন একটি দেওয়ার ইখতিয়ার তো রয়েছে। ফলে ইখতিয়ারের সুযোগে এখানে নষ্ট হয়নি, মনসুখ করা হয়েছে বলেও মনে করার কারণ ঘটেনি। বহু কতগুলোর মধ্যে থেকে তিনটির মধ্যে সে ইখতিয়ার বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোনো আয়াত পাঠের পক্ষে যদি সাহাবীদের কোনো কথা বা কাজ পাওয়া যায় যা এক আয়াতের কম নয়, তাহলে তাতেও মূল হুকুম মনসুখ

হওয়ার কারণ ঘটে না। কেননা তখনও কুরআনের যেকোন আয়াত পড়ার ইখতিয়ার পুরাপুরিভাবে অবশিষ্ট থাকে।

একজন মনীষী বলেছেন, **فَأَفَرُّ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** (কুরআনের যা-ই পড়া তোমার পক্ষে সহজ হবে তা-ই পড়) এ আদেশ সূরা আল-ফাতিহা বাদে কুরআনের অপরাপর অংশ পর্যায়ে গ্রহণীয়। তাহলে তাতে কোনো কিছু মনসুখ প্রশ্ন দেখা দেবে না।

কিন্তু এ গ্রন্থকারের মতে তা জায়েয হতে পারে না। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি এই যে, উক্ত আয়াতে কুরআন পাঠের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা নামাযে পড়ার জন্যেই। কাজেই তা বাদ দিলে ইবাদতই হতে পারে না। তা নামাযের রুকন। এ রুকন আদায় না হলে নামাযই সহীহ হবে না।

দ্বিতীয়ত নামাযে যা-ই পড়া হবে, তার সমস্তটাতাই এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। কাজেই তার কিছুকে বাদ দিয়ে অপর কিছুকে নির্দিষ্ট করা জায়েয হতে পারে না।

তৃতীয়ত **فَأَفَرُّ مَا تَيَسَّرَ** (পড়া যা-ই সহজ...) একটি আদেশ। তা অবশ্যই পালনীয়। কাজেই তাকে মুস্তাহাব বলা জায়েয হতে পারে না। পড়া ফরযই মনে করতে হবে। এখানে যা বলেছি তা একটি হাদীসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ ﷺ: «إِنَّهُ لَا يَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ فَيَضَعِ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَكْبِرَ وَيَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَيُسَنِّيَ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعَ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ».

[৮১] ‘মুহাম্মদ ইবনে বকর (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), মুওয়ায্মাল ইবনে ইসমাঈল^১ (রহ.), হাম্মাদ^২ (রহ.), ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রহ.), আলী ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খাল্লাদ (রহ.) সূত্রে হযরত ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায পড়ল। পরে রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে তাকে সালাম জানালো। রাসূলে করীম (সা.) তার জবাব দিয়ে বললেন, ‘তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়। কেননা তোমার নামায পড়া হয়নি।’ লোকটি ফিরে গিয়ে নামায পড়ল পূর্বের মতোই। পরে আবার রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে সালাম দিল। কেননা তোমার নামায পড়া হয়নি। এভাবে লোকটি তিনতিন বার উঠে গিয়ে নামায পড়ল। শেষে রাসূলে করীম (সা.) বললেন, ‘একজন লোকের নামায তখন সম্পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতা করতে পারে, যদি সে অযু করে, ঠিকঠিকভাবে প্রত্যেকটি অঙ্গ ধৌত করে, পরে সে তাকবীর বলে আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করে, কুরআন থেকে ইচ্ছামতো কিছু পড়ে, পরে আল্লাহ আকবর বলে রুকু করে ও তাতে তার সমস্ত জোড়া স্থিত হয়ে বসে।’^৩

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا نَسَسَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ».

[৮২] ‘মুহাম্মদ ইবনে বকর (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না^৪ (রহ.), ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.), আবদুল্লাহ^৫

^১ মুওয়ায্মাল ইবনে ইসমাঈল: বস্তুত মুসা ইবনে ইসমাঈল: আবু সালামা, মুসা ইবনে ইসমাঈল আল-কা'নাবী আত-তাযযাকী (রহ.)

^২ হাম্মাদ: আবু সালামা, হাম্মাদ ইবনে সালামা ইবনে দীনার আল-বাসরী (রহ.)

^৩ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩১, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪, হাদীস: ১৮৯৯৭; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৪৬০; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৬-২২৮, হাদীস: ৮৫৭-৮৬০; (ঘ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১০০-১০১, হাদীস: ৩০২

^৪ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না: আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ইবনে ওবাইদ আল-বাসারী (রহ.)

^৫ আবদুল্লাহ: আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হাফস ইবনে আসিম ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রহ.)

(রহ.), সাইদ ইবনে আবু সাঈদ (রহ.) তাঁর পিতা^১ সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায পড়লো। পরে এসে সালাম করল। এই সূত্রের বর্ণনা পূর্ববর্তীটির মতোই। রাসূলের কথাটি তাতে এ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে, ‘তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর দেবে। পরে কুরআনের যা পড়া তোমার পক্ষে সম্ভব পড়বে। অতঃপর রুকু করবে।’^২

ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.) বলেছেন, প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, «ثُمَّ اقْرَأْ مَا شِئْتَ» (অতঃপর যা তুমি চাও)। আর দ্বিতীয় হাদীসের কথা: «مَا تَيْسَّرَ» (যা সহজ সম্ভব)। দুটিতেই নামাযীকে যা ইচ্ছা পড়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। সূরা আল-ফাতিহা পাঠ যদি ফরয হতো তা হলে তার বিশেষভাবে অবশ্যই শিক্ষা দিতেন। কেননা লোকটি যে নামায কিভাবে পড়তে হয় তা জানে না, একথা তো জানাই আছে। অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তিকে তো অসম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া জায়েয হতে পারে না। তাকে কিছু ফরয জানানো হবে, অপর কিছু ফরয জানানো হবে না তা সমীচীন হতে পারে না। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, সূরা আল-ফাতিহা পড়া ফরয নয়।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ إِسْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ يُقْرَأُ فِيهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الْقُرْآنِ».

[৮৩] ‘আবদুল বাকী ইবনে কানি’ (রহ.), আহমদ ইবনে আলী আল-জায্যার (রহ.), আমির ইবনে সাইয়ার (রহ.), আবু শায়বা ইবরাহীম ইবনে উসমান (রহ.), সুফিয়ান^৩ (রহ.), আবু নাযরা^৪ (রহ.), হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ‘এমন কিরাআত যাতে সূরা আল-ফাতিহা কিংবা

^১ তাঁর পিতা: আবু সাঈদ, সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ কায়সান আল-লায়সী আল-মাকবুরী (রহ.)

^২ (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫২, হাদীস: ৭৫৭; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৮, হাদীস: ৪৫ (৩৯৮); (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩৩৬, হাদীস: ১০৬০; (ঘ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৬, হাদীস: ৮৫৬

^৩ সুফিয়ান: আবু মুহাম্মদ, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না ইবনে আবু ইমরান মায়মুন আল-কুফী আল-মক্কী (রহ.)

^৪ আবু নাযরা: আল-মুনযির ইবনে মালিক ইবনে কুতাআ আল-আবাদী আল-বাসরী (রহ.)

কুরআনের জন্যে কোনো অংশ পড়া না হলে তার নামায হবে না।”^১
 وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ
 رَافِعٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ
 ثُمَّ أَقْرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ».

[৮৪] ‘মুহাম্মদ ইবনে বকর (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ওয়াহ্ব ইবনে বকিয়া^২ (রহ.), মাখলাদ^৩ (রহ.), মুহাম্মদ ইবনে আমর^৪ (রহ.), আলী ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খাল্লাদ (রহ.), রিফায়া ইবনে রাফি’ (রহ.) সূত্রেও এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ‘তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন কিবলামুখী হবে, পরে তাকবীর বলবে। অতঃপর সূরা আল-ফাতিহা ও আল্লাহ যা পড়া পছন্দ করেন তাই পড়বে।’^৫

এতেও সূরা আল-ফাতিহা ও তাছাড়া অন্য কিছু পড়ার উল্লেখ হয়েছে। একথা অন্যান্য হাদীসের বিপরীত নয়। কেননা এর বক্তব্য হল, সূরা আল-ফাতিহা পড়বে যদি তা পড়া সহজ হয়। এতে কোনো আয়াত নির্দিষ্টভাবে পড়া ফরয বলা জায়েয হতে পারে না। অন্যথায় দেয়া ইখতিয়ার মনসুখ করা হবে। এ-ও জানা আছে যে, দুটি হাদীসের কোনো একটি অপরটির দ্বারা মনসুখ হয়নি। দুটি হাদীসই তো একই ঘটনার বিষয়ে।

প্রশ্ন হতে পারে, দুটি হাদীসের একটিতে কুরআন পড়া পর্যায়ে ইখতিয়ার থাকার কথা রয়েছে, আর অপরটিতে কোনো ইখতিয়ার ছাড়াই সূরা আল-ফাতিহা পড়ার হুকুম রয়েছে, তাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পর আর
 «بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ» (যা পড়া হোক বলে আল্লাহ চান) একথা বলে ইখতিয়ার

^১ (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩১৬, হাদীস: ৩৬১৮; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৭৩, হাদীস: ৮৩৭; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৪৬৩, হাদীস: ২৩৮

^২ ওয়াহ্ব ইবনে বকিয়া: আবু মুহাম্মদ, ওয়াহ্ব ইবনে বকিয়া ইবনে ওসমান আল-ওয়াসিতী (রহ.)

^৩ মাখলাদ: বস্তুত খালিদ: খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হারমালা আল-মাদলিজী আল-হিজায়ী (রহ.)

^৪ মুহাম্মদ ইবনে আমর: মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ.)

^৫ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩১, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪, হাদীস: ১৮৯৯৭; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ৪৬০; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৬-২২৮, হাদীস: ৮৫৭-৮৬০; (ঘ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১০০-১০১, হাদীস: ৩০২

দেওয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, সূরা আল-ফাতিহা পড়া-না পড়ার কোনো ইখতিয়ার দেওয়া হয়নি, ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পর অন্য আয়াত পড়ার ব্যাপারে। কোনো হাদীসে সূরা আল-ফাতিহার উল্লেখ না হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, তা হয়েছে বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে। তা ছাড়া এ হাদীসটিতে অতিরিক্ত কথা হিসেবে রয়েছে কোনো ইখতিয়ার ছাড়া সূরা আল-ফাতিহা পড়ার কথা।

জবাবে বলা যাবে, যে হাদীসে ইখতিয়ারের কথা আছে তাকে যে হাদীসে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার নির্দেশ আছে তার ওপর নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করা জায়েয হতে পারে না, যেমন দাবি করা হয়েছে। কেননা সম্ভবত দুটিকেই কোনোরূপ বিশেষত্ব ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে। বরং আমাদের বলা উচিত যে, সাধারণভাবে যে ইখতিয়ারের উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে তার হুকুমটা সেই হাদীসেও প্রয়োগযোগ্য, যাতে বিশেষভাবে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার কথা বলা হয়েছে। তাতে সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য যেকোন আয়াত পড়ার ব্যাপারে ইখতিয়ারটা ধারণ রূপ পাবে। যেন বলা হয়েছে, ইচ্ছে করলে সূরা আল-ফাতিহা পড়তে পার তার সাথে অন্য কিছু আয়াত মিলিয়ে। তাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়ায় যে ইখতিয়ার রয়েছে তার প্রয়োগ ব্যাপক হবে এবং কোনটি বাদ দিয়ে কোনটি পড়ার ব্যাপারে বিশেষত্ব আরোপ করা হবে না। তা একথা একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى،
قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ
التَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُخْرِجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ
أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ».

[৮৫] ‘মুহাম্মদ ইবনে বকর (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইবরাহীম ইবনে মুসা’ (রহ.), ঈসা^২ (রহ.), জাফর ইবনে মায়মুন আল-বাসরী (রহ.), আবু উসমান আন-নাহদী^৩ (রহ.) সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রহ.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ‘বের হয়ে মদীনার সর্বত্র ঘোষণা করে দাও যে, কুরআন ছাড়া নামায

^১ ইবরাহীম ইবনে মুসা: ইবরাহীম ইবনে মুসা ইবনে ইয়াযীদ আত-তায়মী আল-ফাররা আর-রাযী (রহ.)

^২ ঈসা: ঈসা ইবনে ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক আস-সাবীযী আল-কুফী (রহ.)

^৩ আবু উসমান আন-নাহদী: আবু উসমান, আবদুর রহমান ইবনে মুল্ল আন-নাহদী আল-বাসরী (রহ.)

হবে না। সূরা আল-ফাতিহাও যদি হয়... আর তার বেশি যাই হোক (অবশ্য পড়তে হবে)।”^১

রাসুলের কথা: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِالْقُرْآنِ» (কুরআন ছাড়া নামায হবে না) থেকে বোঝা যায়, কুরআনের যা-ই পড়া হবে তাতেই নামায হয়ে যাবে। আর «وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا رَادَّ» (সূরা আল-ফাতিহাও যদি হয় তার পর যা বেশি হয়) কথাটি থেকে বোঝা যায়, সূরা আল-ফাতিহা না পড়লেও নামায হবে। কেননা কুরআনের কোনো অংশ পড়া নির্দিষ্টভাবে ফরয হলে কথাটি এভাবে বলা হতো না, বরং সূরা আল-ফাতিহা পড়ার কথা অকাট্যভাবে বলা হতো। এ পর্যায়ে আরও একটি হাদীস উল্লেখ:

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ».

[৮৬] ‘ইবনে উয়ায়না (রহ.), আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলে করীম (সা.) বলেছেন, ‘যে নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়া হবে না, তা ক্রটিপূর্ণ।’^২

ইমাম মালিক (রহ.) ও ইবনে জুরাইজ (রহ.) আল-আলা (রহ.) থেকে হিশাম ইবনে যুহরার মুক্ত গোলাম আবুস সাযিব^৩ (রহ.) সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে নবী করীম (সা.)-এর উক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন।^৪

সনদে এই পার্থক্য হাদীসটিকে দুর্বল করে দেয়নি। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (আল-আলা) তাঁর পিতা ও আবুস সাযিব (রহ.) উভয়

^১ (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১৬, হাদীস: ৮১৯; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১২১-১২২, হাদীস: ৩১৩; (গ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৯৩-৯৪, হাদীস: ১৭৯১

^২ তাঁর পিতা: আবদুর রহমান ইবনে ইয়াকুব আল-জুহানী আল-মাদানী (রহ.)

^৩ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ২৩৯-২৪০, হাদীস: ৭২৯১; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৩৮ (৩৯৫)

^৪ আবুস সাযিব: আবুস সাযিব আল-আনসারী (রহ.)

^৫ (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৯৪, হাদীস: ২৪৫; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১৬-২১৭, হাদীস: ৮২১; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২০১-২০২, হাদীস: ২৩৫৩; (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৯০৯

থেকেই শ্রবণ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, নামাযে ক্রটিপূর্ণ হওয়ার কথা। তাতে বোঝা যায়, নামায তো হয়ে যায়, যদিও তা হয় ক্রটিপূর্ণ। কেননা নামায বৈধ না হলেও তাতে 'ক্রটি' হওয়ার কথা বলা হতো না। ক্রটিপূর্ণ হওয়ার কথা বলা হলে তাতে নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার কথার বিপরীত বলা হয়। কোনো জিনিস প্রতিষ্ঠিত না হলে তার ক্রটিপূর্ণ হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কোনো উট যদি গর্ভবতী না-ই হয়, তাহলে একথা বলা হয় না যে, তা ক্রটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব করেছে। হ্যাঁ, ক্রটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব হলেই তবে বলা যাবে যে, ক্রটিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বাচ্চাটি জন্ম গ্রহণ করেছে অথবা যদি গর্ভের মেয়াদ পূর্ণ না করেই প্রসব করা হয় তাহলেও তা বলা যায়। কিন্তু মূলতই যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকে তাহলে তার ক্রটিপূর্ণ বাচ্চা প্রসবের কথা বলা যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সূরা আল-ফাতিহা ছাড়াও নামায হয়, যদিও ক্রটিপূর্ণভাবে। ক্রটিপূর্ণ হওয়াটা মূলকে অস্বীকার করে না। বরং মূলটা হওয়ার কথাই প্রমাণ করে। তবেই না তার সহীহ হওয়ার কথা বলা যায়।

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خَدَاجٌ».

[৮৭] 'আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয় যুবারর (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযি.) সূত্রে নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'যে নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়া হয়নি তা ক্রটিপূর্ণ।'^১

এ নামায ক্রটিপূর্ণ অবস্থায়ই হবে। ক্রটিপূর্ণ হলে মূল নামায হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়।

وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيُ الصَّلَاةَ يُكْتَبُ لَهُ نِصْفُهَا مُسْمًهَا عُسْرُهَا».

[৮৮] 'নবী করীম (সা.) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'ব্যক্তি যেন অবশ্যই নামায পড়ে। তা হলে তার অর্ধেক, ৫ ভাগের এক ভাগ, ১০ ভাগের এক ভাগ তার জন্যে লিখিত হবে।'^২

^১ (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৩৬২০; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪২, পৃ. ৩৫, হাদীস: ২৫০৯৯; (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৮৪০

^২ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩১, পৃ. ১৭১, হাদীস: ১৮৮৭৯ ও পৃ. ১৮৯, হাদীস: ১৮৮৯৪; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১১, হাদীস: ৭৯৬; (গ) আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৪০, হাদীস: ৬৮৫

এতেও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুন তার কোনো অংশ বাতিল হয়ে যায়নি। কেউ যদি বলেন, নিম্নোক্ত হাদীস:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ».

[৮৯] ‘মুহাম্মদ ইবনে ইজলান (রহ.) তাঁর পিতা^১র নিকট থেকে, তিনি হিশামের মুক্ত গোলাম আবুস সাযিব (রহ.) থেকে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূলে করীম (সা.)-এর এ কথা রয়েছে, ‘যে লোক নামায পড়ল, কিন্তু তাতে কুরআনের কোন অংশ পড়লো না তাতে নামায ক্ষতিগ্রস্ত হল, ক্ষতিগ্রস্ত হল, অসম্পূর্ণ থাকলো।’^২

এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রহ.) ও ইবনে উয়ায়না (রহ.) বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হল। কেননা এ দু’জন তাদের বর্ণিত হাদীসে সূরা আল-ফাতিহার উল্লেখ করেছেন, অন্য কিছু নয়। আর নিয়মানুযায়ী দুটি হাদীসের একটি অপরটির বিপরীত হলে দুটিই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তাতে সূরা আল-ফাতিহা না পড়লে যে নামায অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ হবে সে কথা প্রমাণিত হল না।

এর জবাবে বলা যাবে, মুহাম্মদ ইবনে ইজলান (রহ.)-এর বর্ণনাকে ইমাম মালিক (রহ.) ও ইবনে উয়ায়না (রহ.)-এর বর্ণনার বিপরীত বলা যাবে না। বলতে হবে, ভুল-ভ্রান্তি ও গাফিলতিই ওই দু’জনের তুলনায় এর ওপর অধিক গ্রাসী হয়েছে। অতএব তা দিয়ে ওই দু’জনের বর্ণনার ওপর কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। আর মূলতও এ দুটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা হতে পারে-নবী করীম (সা.) সব কথাই বলেছেন। পরের কখনও সূরা আল-ফাতিহার উল্লেখ করেছেন, আর অন্যবারে শুধু কুরআন পাঠের কথা বলেছেন। আর এ-ও হতে পারে যে, এ দুটি হাদীসের নির্দিষ্ট করে যা বলা হয়েছে সাধারণভাবে সেই কথাটিই বলা হয়েছে।

^১ তাঁর পিতা: আল-ইজলান আল-মাদানী (রহ.)

^২ (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৯৪, হাদীস: ২৪৫; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ২৩৯-২৪০, হাদীস: ৭২৯১; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৩৮ (৩৯৫); (ঘ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১৬-২১৭, হাদীস: ৮২১; (ঙ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২০১-২০২, হাদীস: ২৩৫৩; (চ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৯০৯

প্রশ্ন হতে পারে, নবী করীম (সা.) দুটি কথাই বলেছেন, এ যখন তোমার ধারণা তখন দেখা যায়, মুহাম্মদ ইবনে আজলান (রহ.) বর্ণিত হাদীস কোনোরূপ কিরাআত ছাড়াই নামায হতে পারে বলেছে। কেননা তা কিরাআত ছাড়াই নামাযকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বলেছে।

এর জবাবে বলতে হবে, এ প্রশ্নটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। আমরা বলব, উভয় হাদীস থেকে বাহ্যত তা-ই বোঝা যায়। তবে এতটুকু তো প্রমাণিত হয় যে, কিরাআত পাঠ না করলে তাতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে আমরা এ দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করেছি।

ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.) বলেছেন, সূরা আল-ফাতিহা পড়া পর্যায়ে আরও বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যারা তা পড়া ফরয মনে করেছেন, তারা সেসব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন:

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الْفَاتِحَةُ] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي...».

[৯০] ‘আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে এবং [৯১] হিশাম ইবনে জুহরার মুক্ত গোলাম আবুস সাযিব (রহ.) কর্তৃক হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু’ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাঁর অর্ধেক আমার আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার। বান্দা যখন **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা হাম্দ করেছে...।’^১

এ হাদীসে ‘সালাত’ বলে সূরা আল-ফাতিহা বুঝিয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে, নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ অন্যতম ফরয। যেমন—

^১ (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ৯৪, হাদীস: ২৪৫; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ২৩৯-২৪০, হাদীস: ৭২৯১; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৩৮ (৩৯৫); (ঘ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১৬-২১৭, হাদীস: ৮২১; (ঙ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২০১-২০২, হাদীস: ২৩৫৩; (চ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৯০৯

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ^১ বলে ফজর নামাযে কুরআন পাঠ বোঝানো হয়েছে। এতেও বোঝা যায় যে, নামাযে কুরআন পাঠ ফরয। (এবং رُكُوعًا مَّكَرَّهَاتٍ لِلْكَافِرِينَ ۝) (এবং রুকুকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকু দাও)^২ বলেও বুঝিয়েছেন নামাযে কুরআন পাঠের এবং তার ফরয হওয়ার কথা।

এর জবাবে বলা যাবে, না। বলা কথাসমূহ নামাযে কুরআন পাঠ ফরয করে দেয় না, রুকু করার আদেশ ও রুকু করাকেই ফরয করে ইতিবাচকভাবে। আর উদ্ধৃত হাদীস ‘নামায’-এর আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে বিভক্ত হওয়ার কথা দ্বারাও নামাযে কুরআন পাঠ ফরয প্রমাণিত হয় না। তা থেকে বড় জোড় এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, নামায সূরা আল-ফাতিহাসহ আদায় করতে হবে। কিন্তু তাতে সূরা আল-ফাতিহা পড়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কেননা ‘নামায’ বলতে নফল ও ফরয সবই বোঝায়। বরং উক্ত হাদীস দ্বারা নবী করীম (সা.) তা ফরয না হওয়ার কথাই প্রমাণ করেছেন। কেননা হাদীসটি শেষাংশে বলা হয়েছে, «فَمَنْ لَمْ يَفْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فِيهَا خِذَاجٌ» (যে লোক নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়েনি, তার নামায ত্রুটিযুক্ত।)^৩ এতে ‘নামায হয়নি’ বলা হয়নি, ত্রুটিপূর্ণ বলা হয়েছে সূরা আল-ফাতিহা না পড়ার দরুন। আর একথা তো জানা-ই আছে যে, কথার প্রথমাংশ দ্বারা দ্বিতীয় অংশকে নাকচ করতে চাওয়া হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর কথা: «فَسَمِّتِ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْمَيْنِ» (নামায আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে) এবং সে পর্যায়ে সূরা আল-ফাতিহার উল্লেখ থেকে নামাযে তা পড়া ফরয প্রমাণিত হয় না। এ পর্যায়ে একটি হাদীসও উল্লেখ্য:

رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعُمَيْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَل-حَارِثِ، عَنْ أَل-مُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَادِعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشْهَدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاسٌ وَتَمَسْكُنُ وَتَقْنَعُ لِرَبِّكَ، وَتَقُولُ اللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فِيهَا خِذَاجٌ».

[৯২] ‘শু’বা’ (রহ.), আবদে রাবিবহি ইবনে সাঈদ (রহ.), আনাস ইবনে আবু আনাস (রহ.), আবদুল্লাহ ইবনে নাফি’ ইবনুল আময়া

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৮

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৪৩

^৩ শু’বা: শু’বা ইবনুল হাজ্জাজ ইবনুল ওয়ারদ আল-আযদী আল-আতাকী (রহ.)

(রহ.), আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রহ.), মুজালিব ইবনে আবু ওয়াদী‘আ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ‘(নফল) নামায দুই দুই রাকআত করে পড়বে। প্রতি দু’রাকআত বসে তাশাহুদ পড়বে, বসবে, স্থিত হবে এবং তোমার রবের জন্যে একান্ত হবে, বলবে, হে আমাদের আল্লাহ! যে তা করবে না, তার নামায ক্রটিযুক্ত হবে।’^১

এ হাদীসে যেসব কাজকে ‘সালাত’ বলা হয়েছে তা তাতে ফরয করা হয়নি। বিরুদ্ধোবাদীরা যে হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন তা হচ্ছে,

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

[৯৩] ‘হযরত উবাদাত ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ‘সূরা আল-ফাতিহা যে না পড়বে, তার নামায হবে না।’^২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَادِيَ: «أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ».

[৯৪] ‘মুহাম্মদ ইবনে বকর (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইবনে বাশ্শার’ (রহ.), জাফর আবু উসমান (রহ.) সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (সা.) আমাকে এই কথা ঘোষণা করে দিতে আদেশ করেছেন যে, ‘সূরা আল-ফাতিহা ও আরও বেশি আয়াত না পড়লে নামায হবে না।’^৩

ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন,

^১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৯, পৃ. ৬৬-৭০, হাদীস: ১৭৫২৩-১৭৫২৯; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪১৯, হাদীস: ১৩২৫; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ২৯, হাদীস: ১২৯৬

^২ (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫১, হাদীস: ৭৫৬; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৩৪-৩৬ (৩৯৪)

^৩ ইবনে বাশ্শার: আবু বকর বুনদার, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার ইবনে ওসমান আল-বাসারী (রহ.)

^৪ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২১৬, হাদীস: ৮১৯

«لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (সূরা আল-ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না)

রাসূল (সা.)-এর একথাটির অর্থ দুটি হতে পারে, মূলতই না হওয়া কিংবা পূর্ণাঙ্গ না হওয়া। যদিও আমাদের মতে বাহ্যত মূলত না হওয়াই এর অর্থ যেন শেষ পর্যন্ত একথাই বোঝা যায় যে, নামায পূর্ণাঙ্গ না হওয়াই এর তাৎপর্য। দুটি অর্থ একসঙ্গে গ্রহণ করা যেহেতু জায়েয নয়। কেননা যখন মূলত না হওয়ার অর্থ করা হবে, তখন তা থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না। যখন পূর্ণাঙ্গ না হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্তভাবে হওয়ার অর্থ নেওয়া হবে তখন তাতে তার কিছু অংশ হওয়া প্রমাণিত হবে। দুটি অর্থ এক সাথে গ্রহণ নিষিদ্ধ, কঠিন। রাসূল (সা.) সে কথা বলে মূলতই না হওয়া বোঝাতে চাননি। তার প্রমাণ এই যে, তা প্রমাণিত হলে «فَأَقْرَأْ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» (পড় কুরআনের যা পড়া সহজ) এ আদেশে যে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে তা বাতিল হয়ে যায়। তাতে আয়াত মনসুখ হওয়া বোঝায়, কিন্তু ‘খবরে ওয়াহিদ’ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত মনসুখ হওয়া জায়েয নয়। নিম্নের হাদীসটিও তাই কথাই প্রমাণ করে:

رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ فَضِيلٍ وَأَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة] وَسُورَةٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا» .

[৯৫] ‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.), [৯৬] আবু মুআবিয়া^১ (রহ.), [৯৭] ইবনে ফুযায়ল^২ (রহ.) ও আবু সুফিয়ান^৩ (রহ.), আবু নাযরা (রহ.) সাঈদ^৪ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, ‘ফরয ও অন্যান্য নামাযের প্রতি রাকআত সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা যে পড়েনি তার নামায জায়েয হয়নি।’^৫

তবে আবু হানিফা সূরা আল-ফাতিহার সাথে অন্য কিছু পড়ার কথা বলেছেন। আর মুআবিয়া বলেছেন, «لَا صَلَاةَ» (নামায নেই বা হয় না।) একথা জানাই আছে যে, মূল নামায না হওয়ার কথাই তাঁরা মনে করেননি। পূর্ণাঙ্গ না

^১ আবু মুআবিয়া: শায়বান ইবনে আবদুর রহমান আত-তায়মী আল-বাসরী (রহ.)

^২ ইবনে ফুযায়ল: আবু আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়ল ইবনে গায়ওয়ান আয-যাব্বী (রহ.)

^৩ আবু সুফিয়ান: আবু সুফিয়ান, তরীফ ইবনে শিহাব আস-সা’দী (রহ.)

^৪ সাঈদ: আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.)

^৫ [৯৫] (ক) আল-খুওয়ারিসমী, *জামিউল মাসনীদ*, খ. ১, পৃ. ৩১২

[৯৬]

[৯৭] (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৪৬৩, হাদীস: ২৩৮; (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৮৩৯

হওয়ার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, কেননা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সূরা আল-ফাতিহা পড়াই কুরআন পাঠের জন্যে যথেষ্ট। তার সাথে অন্য কিছু না পড়লেও নামায হয়ে যাবে।

এ থেকে বোঝা গেল, তাঁরা সকলেই নামাযের পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কথাই বুঝিয়েছেন, নামাযের ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। মূলত না হওয়া ও অপূর্ণাঙ্গ হওয়া এ দুটি পরস্পর বিরোধী কথা বলে দুটি অর্থই একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে না। একটি শব্দের দুই পরস্পর বিপরীত অর্থ গ্রহণ না-জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

কেউ যদি বলেন, এ হাদীসটি হযরত উবাদা (রাযি.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণিত হাদীস থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। আর হতে পারে, রাসূলে করীম (সা.) একবার বলেছেন, «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (সূরা আল-ফাতিহা ছাড়া নামায নেই) এ বলে নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পড়া ফরয করে দিয়েছেন। আর অন্যবারে বলেছেন, সাঈদ বর্ণিত হাদীসটি যাতে সূরা আল-ফাতিহা ও তার সাথে অন্য কিছু পড়ার কথা বলেছেন। আর তা বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সূরা আল-ফাতিহার সাথে অন্য কিছু না পড়লে নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না?

এর জবাবে বলা হবে, হাদীস দুটির ইতিহাস তোমার বা কারোর জানা নেই। রাসূলে করীম (সা.) দু'সময় দু'অবস্থায় বলেছেন, তারও কোনো প্রমাণ নেই। দু'রূপ অবস্থায় দু'হাদীস বলা হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ থাকা আবশ্যিক। অন্যথায় তোমার বিরোধী মতের লোক বলতে পারে যে, নবী করীম (সা.) এ দুটি দু'অবস্থায় বলেছেন, তা প্রমাণিত নয় কেন? অথচ দুটি শব্দই হাদীস দুটিকে একই হাদীসে পরিণত করেছে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী হাদীসের শব্দকে সেভাবেই চালিত করেছেন। আর কেউ কেউ তার কোনো কোনো বর্ণনাকারী হাদীসের শব্দকে উপেক্ষা করেছেন। তা হল সূরার উল্লেখ। এ অবস্থায় দুটি হাদীসই সমান ও অভিন্ন। বেশির ভাগ প্রমাণ এ-ই পাওয়া যায় যে, হাদীস একই অবস্থায় বলা হয়েছিল। এর ফলে তোমার বিরোধীর পক্ষে তোমার ওপর অধিক মর্যাদা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা দুটির ইতিহাস না জানার দরুন দুটিকে একই সময়ের বলে ধরে নেওয়াই উত্তম পন্থা। আর এ কথা যখন প্রমাণিত হল যে, সূরার কথা বাড়তি সহ দুটি কথাই একই সময় বলেছেন। আর জানা-ই ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কথাই প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। আমরা এভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে চাই। ফলে কথাটি এই হাদীসের মতই হয়ে যাবে, যাতে তিনি বলেছেন,

«لَا صَلَاةَ لِحَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».

[৯৮] ‘মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে না পড়লে তা হবে না।’^১

«وَمَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ».

[৯৯] ‘যে লোক আযান শুনে তার জবাব দিল না, তার নামায হলো না।’^২

«وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ».

[১০০] ‘যার আমানতদারী নেই, তার ঈমানই নেই।’^৩

কুরআনের এ আয়াতটিও সেরূপ:

إِنَّهُمْ لَا يُبَايِعُهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَذَّبُ عَنْهُ ۝ الْأَثْقَالُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ۝

‘কেননা তাদের কসমের কোনো বিশ্বাস নেই। সম্ভবত (আবার তরবারির আঘাতের ভয়ে-ই) তারা বিরত হবে। তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেই থাকে...?’^৪

এ হাদীস ও কুরআনের আয়াতে প্রথমে অস্বীকৃতি এবং পরে স্বীকৃতি রয়েছে। কেননা পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। মূলকে অস্বীকার করার ইচ্ছা নয়। অর্থাৎ (আয়াতটির অর্থে) ওরা ওয়াদা পূরণ করবে এমন কসম ওরা করেনি এ জন্যে সে ‘কসম’ বিশ্বাস নয়।

^১ (ক) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ২৯২-২৯৩, হাদীস: ১৫৫২-১৫৫৩; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসনাদ* আল-আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ৮৯৮; (গ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৮১, হাদীস: ৪৯৪২-৪৯৪৫, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৬০, হাদীস: ৭৯৩; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৫১, হাদীস: ৫৫১; (গ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৪১৫, হাদীস: ২০৬৪; (ঘ) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ২৯৩-২৯৪, হাদীস: ১৫৫৫-১৫৫৭:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».

^৩ (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসনাদ ফিল আহাদীস ওয়াল আসান*, খ. ৬, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৩০৩২০; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ১৯, পৃ. ৩৭৫, হাদীস: ১২৩৮৩; (গ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৪২৩, হাদীস: ১৯৪, ইবনে আবু শায়বা (রহ.)-এর ভাষ্য:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ».

^৪ আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১২-১৩

প্রশ্ন হতে পারে, হাদীস কয়টির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হবে না, কেন, আর কুরআনের আয়াতে যে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে তা সূরা আল-ফাতিহাকে বাদ দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, হাদীস যদি আয়াত নিরপেক্ষ ধরা হয়, তাহলেও সূরা আল-ফাতিহা পড়া ফরয হওয়ার মতো কোনো অকাট্য দলীল তাতে পাওয়া যাবে না। যেমন— পূর্বেই বলেছি যে, তার আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা আল-ফাতিহা না পড়লেও মূল নামায হওয়া প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর অন্যান্য হাদীস মূলত না হওয়া ও পূর্ণাঙ্গ না হওয়া দুটিরই সম্ভাবনা প্রকাশ করে। তাছাড়া এসব হাদীস যদি নামাযে নির্দিষ্ট কিছু পড়া ফরয প্রমাণ করত তাহলে আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা এবং তাকে ফরয নামাযের বদলে নফল নামায মনে করা সঠিক হতে পারে না। এ বিষয়ে শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তা পুনরায় পড়ে নিলে পূর্ণ জবাব পাওয়া যাবে, ইনশা আল্লাহ।

ইমাম আবু বকর আল-জাসাস (রহ.) বলেছেন, সূরা আল-ফাতিহা সংক্রান্ত উল্লিখিত হুকুমসহ তা পাঠ করার স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে, আল্লাহ বিশেষভাবে আমাদেরকে হামদ করার আদেশ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে তার নিকট দুআ করবো। একথাও বোঝাচ্ছে যে, সর্বপ্রথম-ই আল্লাহর হামদ করতে হবে, তারপর তাঁর তারীফ-প্রশংসা, তারপর দুআ করা অধিক উত্তম কাজ এবং এ পদ্ধতির দুআই কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী। এ কারণেই সূরা আল-ফাতিহার সূচনা হয়েছে হামদ দ্বারা, তারপর সানা ও তারীফ। বলা হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ...مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ।

তারপর তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি এবং সে কথাটি স্বতন্ত্র ও এককভাবে বলা হয়েছে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ। তারপর তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে সে সমস্ত কাজে ও ব্যাপারে, ইহকালীন ও পরকালীন যেসব ব্যাপারেই আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী, তা আল্লাহর বান্দা হয়ে করার সুযোগ পাওয়ার জন্যে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। বলে। পরে হেদায়তের ওপর দৃঢ়তার প্রার্থনা করা হয়েছে। এ কারণেই তো আল্লাহর হামদ করার দরকার হয়েছে, তার তারীফ করা জরুরি হয়েছে এবং তার বান্দা হয়ে থাকা আমাদের জন্যে কর্তব্য হয়েছে। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। বলে যেমন হেদায়ত প্রার্থনা করা হয়েছে, তেমনি তার ওপর দৃঢ় হয়ে থাকার তওফীকও চাওয়া হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতের জন্যে। অতীতের জন্যে এরূপ প্রার্থনা হয় না। কাফিররা আল্লাহকে চিনতে পারেনি, তাঁর হামদ ও সানাও

করেনি। ফলে তারা গোমরাহ হয়ে গেছে। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার তওফীক চাওয়া হয়েছে। কেননা কাফিররা আল্লাহকে চিনতে পারেনি বলে তাঁর গযব ও আযাব পাওয়ার যোগ্য হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর হামদ করার শিক্ষা যেমন দিয়েছেন, তেমনি তা করার আদেশও করেছেন, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ, বাক্যটিই তার প্রমাণ। মনে রাখতে হবে, হামদ করার জন্যে আল্লাহর আদেশ সূরার শুরুতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যেমন বলা হয়েছে, একথা দ্বারা আল্লাহর গযব ও আযাব থেকে বাঁচতে চাওয়া হয়েছে, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এবং রোগের প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে একটি হাদীস উল্লেখ্য:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُعَلَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَمَرَرْنَا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: سَيِّدًا لَدَعْنَهُ الْعَقْرُبُ فَهَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، وَلَمْ أَفْعَلْ حَتَّى جَعَلُوا لَنَا جَعَلًا، جَعَلُوا لَنَا شَاءً، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ؛ فَأَخَذْتُ الشَّاءَ، ثُمَّ قُلْتُ: حَتَّى نَأْيَ النَّبِيِّ ﷺ، فَاتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «عَلِمْتُ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ حَقٌّ اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسْمِهِ».

[১০১] ‘আবদুল বাকী (রহ.), মুআয ইবনুল মুসান্না’ (রহ.), সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রহ.), আবু মুআবিয়া (রহ.), আ’মাশ (রহ.), জাফর ইবনে ইয়াস^২ (রহ.), আবু নাযরা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) বলেছেন, আমরা একটি যোদ্ধাবাহিনীতে ছিলাম। আরবের কোনো এক গোত্রের এলাকায় পৌঁছলাম। গোত্রের লোকেরা এসে বলল, আমাদের সরদারকে সাপে দংশন করেছে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে ঝাড়-ফুক করতে পারে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, কিছু তো করতে পারি, কিন্তু আমাদের জন্যে মেহমানদারির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমরা কিছুই করছি না। ফলে তখনই তারা আমাদের জন্য ছাগলের ব্যবস্থা করল। এরপর আমি

^১ মুআয ইবনুল মুসান্না: আবুল মুসান্না, মুআয ইবনুল মুসান্না ইবনে মুআয ইবনে মুআয (রহ.)

^২ জাফর ইবনে ইয়াস: আবু বশর, জাফর ইবনে ইয়াস (রহ.)

সূরা আল-ফাতিহা ৭বার পড়ে ফুঁ দিলাম। এতে সে লোকটি ভালো হয়ে গেল এবং আমরা ছাগলটি নিয়ে নিলাম। পরে আমরা রাসূলে করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলাম। জবাবে তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি জানি, সূরা আল-ফাতিহা রোগমুক্ত করে, এটি ভালো তদবীর। ছাগলের একটা অংশ আমাকেও দাও।’^১

সূরা আল-ফাতিহার বহু কয়টি নাম রয়েছে। একটি হল **أُمُّ الْكِتَابِ** (উম্মুল কিতাব)। কেননা তা-ই কুরআনের প্রথম সূরা। **أُمُّ الْقُرْآنِ** (উম্মুল কুরআন)ও বলা হয়। দুটি কথার একটি অপরটির বিকল্প। উম্মুল কিতাব বললে উম্মুল কুরআনই বোঝা যায়। কেননা ‘কিতাব’ অর্থ কুরআন, তা সকলেরই জানা। তাই কখনও উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে, কখনও উম্মুল কুরআন। এ উভয় নাম রাসূলে করীম (সা.) থেকে বর্ণিত। **فَاتِحَةُ الْكِتَابِ** (ফাতিহাতুল কিতাব)ও বলা হয়। বলা হয়, **السَّيِّعُ الْمَثَانِي** (মাবউল মাসানী) বারবার আবৃত্তির ৭টি আয়াত।

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّيِّعِ الْمَثَانِي، فَقَالَ: السَّيِّعُ الْمَثَانِي هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ.

[১০২] ‘সাদ্দ ইবনে জুবায়র (রহ.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট সাবউল মাসানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বললেন, সাবউল মাসানী বলতে উম্মুল কুরআন-ই বোঝায়।’^২

সাবউন অর্থ সাত, আর মাসানী বলতে বোঝায়, তা প্রতি রাকআতে আবৃত্তি করতে হয়। এটাই তার নিয়ম। প্রতি রাকআতে পড়তে হয়, সমগ্র কুরআনে এছাড়া আর কোনো আয়াত বা অংশ নেই।

^১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৭, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১১০৭০; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৭২৯, হাদীস: ২১৫৬; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি’উল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯, হাদীস: ২০৬৩-২০৬৪

^২ (ক) আত-তাহাওয়া, *শরহু মা’ আনিয়াল আসার*, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ১১৯২; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৭৩৭, হাদীস: ২০২২; (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৬৬, হাদীস: ২৩৮৭:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر]، قَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وَقَالَ: هِيَ الْآيَةُ السَّابِعَةُ.

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম
২. আবদুর রায্যাক আস-সানআনী: আবু বকর, আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফি আল-হিমযারী আস-সানআনী (১২৬-২১১ হি. = ৭৪৪-৮২৭ খ্রি.), আল-মুসান্নাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)
৩. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান
৪. আবু দাউদ আত-তায়ালিসী : আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনুল জারুদ আত-তায়ালিসী (১৩৩-২০৪ হি. = ৭৫০-৮১৯ খ্রি.), আল-মুসনদ, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)
৫. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), আল-মুসনদ, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ই॥

৬. ইবনে আবু আসিম : আবু বকর, ইবনুন নুযায়ল, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবু আসিম ইবনে মাখলিদ আশ-শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি. = ৮২২-৯০০ খ্রি.), আস-সুন্নাহ,

- আল-মাকতাবুল ইসলামী, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)
৭. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)
৮. ইবনে খুযায়মা : শায়খুল ইসলাম, আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা ইবনুল মুগীরা ইবনে সালিহ ইবনে বকর আস-সুলামী আন-নায়সাপুরী আশ-শাফিয়ী (২২৩-৩১১ হি. = ৮৩৮-৯২৩ খ্রি.), *আস-সহীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (১৩৯০ হি. = ১৯৭০ খ্রি.)
৯. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবাযী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), *আস-সুনান*, দারুল ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান
১০. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (৩০০-৩৫৪ হি. = ৩০০-৯৬৫ খ্রি.), *আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান*, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

॥খ॥

১১. আল-খুওয়ারযিমী : আবুল মুওয়াইয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-খুওয়ারযিমী (৫৯৩-৬৫৫ হি. = ১১৯৭-১২৫৭ খ্রি.), *জামিউল মাসানীদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

॥ত॥

১২. আত-তাবারী : আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি. = ৮৩৯-৯২৩ খ্রি.), *জামিউল বায়ান ফী তাওয়াইলিল কুরআন*, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)
১৩. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)
১৪. আত-তাহাবী : আবু জা'ফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালামা আল-আযদী আত-তাহাবী (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), *শরহ মা'আনিয়াল আসার*, আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৥দ ৥

১৫. আদ-দারাকুতনী : শায়খুল ইসলাম, আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫ হি. = ৯১৮-৯৯৫ খ্রি.), *আস-সুনান*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৥ন ৥

১৬. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা*, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

॥ব ॥

১৭. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আল-বা'সু ওয়ান নুশূর*, মারকাযুল খিদমাত ওয়াল আবহাস আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)
১৮. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আস-সুনানুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)
১৯. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ*, দারুল তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ম ॥

২০. মালিক ইবনে আনাস : ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিমযারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মুওয়াত্তা*, দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)
২১. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

২২. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী : ইমাম, হাফিয, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (১৩১-১৮৯ হি. = ৭৪৮-৮০৪ খ্রি.), কিতাবুল আসার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

॥য॥

২৩. আয-যায়লায়ী : আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ আয-যায়লায়ী (০০০-৭৬২ হি. = ০০০-১৩৬০ খ্রি.), নসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া, দারুল রাইয়ান লিত-তাবাআতি ওয়ান নশর, বয়রুত, লেবনান ও দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

॥হ॥

২৪. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)